মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা

VOL.-7 APRIL, 2003 NO. 2

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhaiti, Calcutta-700058 (Tel : 033-25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-233208)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005.
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 01334-216575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445, Uttaranchal
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P. (Tel : 05865-251369)

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ৭	এপ্রিল ২০০৩	সংখ্যা ২

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারত – ৬০ টাকা
বিদেশে – ১২ ডলার অথবা ৪৫০ টাকা
প্রতি সংখ্যা – ২০ টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২, কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

বিষয় সূচী

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT. FORM IV (RULE 8)

1.	Title of Newspaper	:	**Ma Anandamayee Amrit Varta**
2.	Place of publication	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi-1**
3.	Periodicity of publication	:	**Quarterly**
4.	Printer's Name	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address		**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
5.	Publisher's Name	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-1**
6.	Editor	:	**Panu Brahmachari**
	Whether citizen of India	:	**Yes**
	Address	:	**Shree Shree Ma Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi-1**
7.	Name & address of the owner, who owns the Newspaper	:	**Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd) H.O., Kankhal, Hardwar-249408**

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March, 1,2003

(Sd) PANU BRAHMACHARI
Publisher.

মাতৃবাণী

নববর্ষ–নূতন জীবনে ভগবৎপথের যাত্রী হয়ে নূতন নূতন পরিস্থিতি প্রাপ্তির চেষ্টা হওয়া।

★ ★ ★

যদিও তিনি ভিতরে বাইরে সর্বদাই রয়েছেন, তবুও ভাবে ও কর্মে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত রাখা দরকার। কেন না জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারগুলি এমনভাবে বদ্ধ করে রেখেছে যে তাঁর সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

★ ★ ★

আচারবান না হলে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কথায় বলে, "আচারের ঘর আছাড়ে ভাঙে না।" শৌচাদির প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখে সদ্‌বিধি অনুসরণ ও শুদ্ধাচারী হওয়া আবশ্যক।

★ ★ ★

কোন কোন সময়ে তোদের মুখে এক অজুহাত শুনি–"তাঁর কৃপা না হলে কি ডাকা যায়?" তাঁর কৃপা সব সময়ে আছে বলেই তো বেঁচে আছিস। তোরা একটু ধৈর্য ধরে নিজের উপর লক্ষ্য কর দেখি, তাহলে তাঁর কৃপার আভাস পাবি।

★ ★ ★

শূন্য হলে সাদা হওয়া যায়, কিম্বা সকলের ভিতর হারিয়ে গেলেও সাদা হওয়া যায়। সাদা সকল রূপ নিয়ে অরূপ হয়ে আছে, অথবা অরূপের রূপই সাদা। সাদা হতে হলে সিধা থাকতে হয়।

★ ★ ★

সত্য ও সরলতার আশ্রয়ে বাহিরে ভিতরে দুধের মত সাদা হবার চেষ্টা কর, তা হলে নিজে তো সুখে থাকবিই, অন্যেরাও তোর কাছে এসে সুখ পাবে।

★ ★ ★

ত্যাগী হওয়াই সাদা বা সরল হওয়ার লক্ষণ। আত্মাভিমান শূন্য হয়ে জগতের ভিতর ছড়িয়ে পড়, দেখবি তোর শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্য সকলে ব্যস্ত হবে এবং তোর আদর্শ কর্মে ও ধর্মে সর্বত্র মঙ্গল বিধান করবে।

★ ★ ★

এই ভোগ-বিলাসের দিনে ত্যাগপূত সরলতাই মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণত্যাগের নামই পূর্ণভোগ।

★ ★ ★

অনেকেই বলে, "কীর্তনের হৈ চৈ ভাল লাগে না; একটু একান্তে বসে তাঁকে ডাকি।" আসল কথা, যদি নির্জনে বসে তাঁর সন্ধান পাস, সে তো খুবই ভাল। কিন্তু মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে দেখিস তো, মন কি সে সময় তাঁর খোঁজ করে, না সংসারের ধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়ায়?

★ ★ ★

কীর্তনের মাতামাতিতে মন না রেখে যদি নামের দিকে লক্ষ্য রাখিস, খোল করতালের নানা সুর, তাল ও ঠোকার প্রতি কান না দিয়ে ধূন বা শেষ আওয়াজটির যদি অনুসরণ করিস, তাহলে দেখবি ভাব সহজেই জাগ্রত হবে।

★ ★ ★

সাধারণের পক্ষে সূক্ষ্মতত্ত্বের জন্য স্থূল সঙ্গ খুব আবশ্যক। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সর্বদা কীর্তন করবি। ইহার সুবিধা না থাকলে যেখানে কীর্তনাদি হয় সে জায়গায় যাবি।

★ ★ ★

নাম করতে করতে কীর্তনের ভাব আসে, আর কীর্তন করতে করতে জপ, ধ্যান, ধারণা আসে। পূজা অর্চনাতে যেরূপ নিষ্ঠা নিয়ে কর্মাদির বিধান আছে, কীর্তন সেরূপ ভাবে করা আবশ্যক।

★ ★ ★

এক সুর, এক তাল হলেই ভাল হয়। যাঁকে নিয়ে কীর্তন, তাঁকে স্মরণে রাখিস, নতুবা কেবল বাদ্যোৎসব হবে, নাম কীর্তন নয়।

★ ★ ★

শরণাগত ভক্ত হতে হলে ভাষা ও ভাব থেকে 'আমি' র মূলোচ্ছেদ করে বুদ্ধি-বিচারটা একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া আবশ্যক।

★ ★ ★

ভগবান ও জীবের নিত্য বিরহ আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। ভগবান সর্বদা জীবকে কোলে করবার জন্য প্রস্তুত। আর জীব আপন কর্মচক্রে পড়ে তাঁর ভিতর থেকেও অন্ধের মত তাঁকে দেখেও না, খোঁজেও না।

★ ★ ★

সাধন ভজনে অনুরাগী হলে দেখা যায়., এই বিরহ বা বিচ্ছেদই মিলনের সেতু এবং আনন্দেরই উৎস খুলে দেয়।

★ ★ ★

মিলনের আশা মিলনের চেয়েও সুখকর এবং যতই শ্রদ্ধা, ভক্তি বাড়তে থাকে, ততই এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ব্যাকুলতা, প্রার্থনা ইত্যাদি পূর্ণতায় পৌঁছায়।

★

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

শিবরাত্রির উৎসব—

২৯শে মাঘ, বৃহস্পতিবার (ইং ১২/২/৫৩)

আজ শিব চতুর্দ্দশী, এবারও আশ্রমের বিভিন্ন স্থানে শিবপূজা হইল। ঁঅন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে যে দুইটি শিব আছেন তাঁহাদের পূজাত হইলই, তাহা ছাড়া ঐ মন্দিরের বারান্দায় এক শিব স্থাপন করিয়া আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণ এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ পূজা করিয়াছেন। নীচে বাসন্তী মন্দিরেও মেয়েরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া শিবপূজা করিয়াছে—একদিকে আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীগণ এবং অন্যদিকে আর কুমারীগণ। বিল্ববৃক্ষের নীচে ঢাকার যে শিব আছেন তাঁহার পূজা করিয়াছেন কমলদাদা। প্রহরে প্রহরে পূজার অবসরে যে সময় পাওয়া গিয়াছে উহা ব্রতিগণ ভজনকীর্তন করিয়া কাটাইয়াছেন। এই ভাবে আজ সমস্ত রাত্রিই পূজা এবং কীর্তনে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলের মধ্যেই এক প্রফুল্ল ভাব, ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন কাহারও মধ্যে দেখা গেল না।

রাত্রির অধিকাংশ সময় মা ঁঅন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া কাটাইলেন। ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে মা ও কিছুক্ষণ "জয় শিব শঙ্কর ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর" এই পদটি কীর্তন করিলেন। মাঝে মাঝে মেয়েদের মধ্যে গিয়া তাহাদেরও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিলেন। একবার মা নীচে গিয়ে পুনরায় যখন মন্দিরের বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার নববধূর বেশ। একখানা সূক্ষ্ম রেশমের শাড়ী পরিধান করিয়াছেন। মস্তকের উপর অবগুন্ঠন টানিয়া দিয়াছেন। দিব্য জ্যোতিঃতে তাঁহার মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ মনোহর রূপ দেখিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং পার্ব্বতীই কৈলাসশিখর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন। উপর আসিয়াই মা বলিলেন, "আমাকে ফুল দাও। আমিও পূজা করিব।" নারায়ণস্বামী এক ঝুড়ি ফুল ও বিল্পপত্র মায়ের সম্মুখে ধরিলেন। মা নারায়ণস্বামীকে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলে, নারায়ণস্বামী বলিতে লাগিলেন, "এষ সচন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলিঃ নমঃ শিবায় নমঃ," আর মা ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্রতিদের গায়ে ফুল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। পূজায় ব্রতিদিগকে মা এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদের নিকট আসিয়াও ঐরূপ করিতে লাগিলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মা আমাকে কাছে আসিতে বলিলেন। আমি কাছে গেলে মা আমার গায়েও ঐরূপ ফুল ছিটাইয়া দিলেন। দোতলার সকলকে এইভাবে আশীর্ব্বাদ করিয়া মা নীচে বাসন্তী মন্দিরে মেয়েদের কাছে গেলেন। ঐখানে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য আমিও নীচে চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, মা উপরে যাহা করিয়াছেন, নীচে আসিয়াও তাহাই করিতেছেন। কিছুক্ষণ পর নারায়ণস্বামীসহ মা বাসন্তী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলে নারায়ণস্বামী আমাকে ঐখানে উপস্থিত দেখিয়া মাকে বলিলেন, "মা, অমূল্যদাদাকে ত আশীর্ব্বাদ দেওয়া হয় নাই"। মা বলিলেন,

"অমূল্যকে একবার দিয়াছি। আচ্ছা, যখন বলিতেছ তখন আবার দিতেছি।" এই বলিয়া মা বিল্বপত্রসহ তাঁহার পাবন করকমল আমার মস্তকে স্থাপন করিলেন। উহার মঙ্গলস্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ যেন শীতল হইয়া গেল। আমি হর্ষরোমাঞ্চিত কলেবরে শ্রীশ্রীমায়ের রাতুলচরণে প্রণাম করিলাম। এই পূণ্যতিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের করস্পর্শ লাভ করিয়া নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইলে শিবরাত্রির মাহাত্ম্য পাঠ হইল। ইহার পরে মা বিশ্রাম করিতে তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমরা ও নিজ নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আশ্রমে গিয়া পারণ করিতে আমাদিগকে বলা হইল।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার (ইং ১৩/২/৫৩)

আজ গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় আসিতে একটু বেলা হইয়া গেল। বাসায় পৌঁছিয়া দেখি যে আমাদের পারণের জন্য আশ্রম হইতে প্রচুর পরিমাণে ফল এবং মিষ্টি পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রসাদ পাইয়া বেলা ১০টার সময় আশ্রমে গেলাম। মাকে অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় পাইলাম। এবার এইখানেই পাঠ এবং সৎসঙ্গ প্রভৃতি হইতেছে। ইহার কারণ এই যে আশ্রমের ঘাট মেরামতের জন্য যে সকল কূপ খনন করা হইয়াছে, উহার জন্যই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক আশ্রমের চত্বর হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের সমস্ত ঘরগুলি ফাটিয়া গিয়াছে। এমনকি কন্যাপীঠের নীচের তলায় মা যে ঘরে শয়ন করেন উহাতেও ফাটল ধরিয়াছে। এই কারণে হলঘরে এবং উহার পার্শ্ববর্তী ঘরগুলিতে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। হলঘরে এতগুলি লোককে যাইতে দেওয়া হইলে অকস্মাৎ কোন বিপদ হইতে পারে মনে করিয়া এবার সৎসঙ্গ প্রভৃতি অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় হইতেছে। মা একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তোমরা অন্নপূর্ণার সম্মুখে কীর্তন এবং সৎসঙ্গ কর না দেখিয়া মা অন্নপূর্ণাই হলঘরের ঐ অবস্থা করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার সম্মুখে পাঠ এবং কীর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন।"

ভগবান কি করেন ?

আজ সকালে পাঠ কীর্তনাদি নিত্যকৃত্য শেষ হইলে এক ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?" উত্তরে মা সচরাচর যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাই বলিলেন। মা বলিলেন, "আপনাকে আপনার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেল। এই আপন কে? যাহার সহিত নিজকে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে? এই আপন হইলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান ভিন্ন সংসারে আর যাহা কিছু আপন বলিয়া মনে করিবে, উহাই দ্বন্দ্ব ও দুঃখ সৃষ্টি করিবে, কারণ সংসারে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। ছেলের জন্ম হইল, তোমরা সুখী হইলে। আবার ঐ ছেলে যখন মরিয়া গেল তখন তোমাদের দুঃখ হইল। এখানে সুখ দুঃখ তুমি ভিন্ন অপর কাহাকেও উপলক্ষ্য করিয়া হইতেছে বলিয়া দ্বৈতভাব। যতক্ষণ এই দ্বৈতভাব ততক্ষণ দুঃখ, দ্বন্দ্ব এবং ভয় অনিবার্য্য। সেইজন্য মনটাকে সর্ব্বদা ভগবানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। তিনিই একমাত্র নিত্যবস্তু বলিয়া তাহা হইতে পরমসুখ এবং পরমশান্তি পাওয়া যায়। সংসার করিতে গিয়াও ভগবানকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিতে হয়। অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র পালনাদি যাহা কিছু করিবে সমস্তই ভগবৎ সেবাজ্ঞানে করিবে। এইরূপ করার নামই হইল আপনাকে আপনার সহিত বাঁধিয়া ফেলা। এইরূপ করিলে কি হইবে?

না, ইহার ফলে তোমার দ্বৈতভাব কাটিয়া গিয়া তাঁহার প্রকাশ হইল। তোমার মধ্যে তুমি ভগবানের জন্য একটু পথ করিয়া দাও। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে তিনি কেমন করিয়া তোমার সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন। তাঁহার কাছে নিজকে শূন্য না করিয়া দিলেত তিনি পূর্ণ করিয়া দেন না। আবার নিজকে শূন্য করিয়া দিবারও প্রয়োজন হয় না; শুধু তোমার ভিতর ভগবানকে প্রবেশ করিবার একটু পথ করিয়া দিলেই তিনি যাহা করিবার তাহা নিজেই করিয়া নেন। ভগবানকে একটু পথ করিয়া দেওয়াই হইল তাঁহার দিকে তোমার মনটি ফেলিয়া রাখা। এই জন্য সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সদগ্রন্থ পাঠ, ধ্যান জপ ইত্যাদি করিতে হয়। এইজন্যই তোমাদিগকে বলা হয় যে বিষয়ের সহিত নিজেকে বাঁধিও না। বিষয় বিষ হয় বলিয়া উহা হইতে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। বিষ পান না করিয়া অমৃত পান কর, অমর ফল খাও তাহা হইলেই তোমরা অমর হইয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম যে তোমরা নিজকে ভগবানের সহিত বাঁধিয়া ফেল তাহা হইলেই তিনি তোমাদের অহঙ্কার খাইয়া ফেলিবেন।

এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে–এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ তাহার চারটি প্রশ্নের সন্তোষজনক ভাবে উত্তর দিতে পারিবে তিনি তাহাকে প্রচুর ধন দিবেন। প্রশ্ন চারটি ছিল এই- –(১) ভগবান কোথায় আছেন? (২) তিনি কি খান? (৩) তিনি কখন হাসেন? এবং (৪) তিনি কি করেন? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেক পন্ডিত লোকই রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের উত্তর শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই ভাবে কিছুদিন গেল। একদিন কয়েকজন পন্ডিত এক মাঠের ভিতর দিয়া রাজসভা অভিমুখে আসিতেছিলেন। তাঁহারা পরস্পরে রাজার প্রশ্ন এবং ঐ সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিতে করিতে আসিতেছিলেন। ঐ মাঠে এক চাষা চাষ করিতেছিল। সে পন্ডিতদের ঐ আলোচনা শুনিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রাজার প্রশ্ন এবং পুরস্কারের সব খবর জানিয়া নিয়া বলিল, "রাজার প্রশ্ন ত এমন কিছু নয় যাহা এযাবৎকাল পন্ডিতেরা সমাধান করিতে পারিলেন না! আমি নিজেই ইহার উত্তর বলিয়া দিতে পারি।" তাহার কথা শুনিয়া পন্ডিতগণ বলিলেন, "তবে তুমি আমাদের সহিত রাজসভায় চল না, দেখি তুমি কি ভাবে এগুলির সমাধান কর।" পন্ডিতদের কথায় ঐ চাষা রাজসভায় যাইতে সম্মত হইল। রাজসভায় পৌঁছিয়া পন্ডিতগণ রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ এই কৃষক আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছে। আপনার প্রশ্ন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা কৃষককে বলিলেন, "তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে আমি প্রচুর ধন দিব।" ঐ চাষা বলিল, "মহারাজ, আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, আমি সাধ্যমত উহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" তখন রাজা বলিলেন, "আচ্ছা বলত ভগবান কোথায় আছেন?" উহা শুনিয়া চাষা বলিল, "মহারাজ, ভগবান নাই কোথায়?" উত্তর শুনিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থই বলিয়াছ।" এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দাও–"ভগবান কি খান?" ঐ কৃষক কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিল, "ভগবান লোকের অহঙ্কার খান।" এই উত্তর শুনিয়াও রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন তাঁহার তৃতীয় প্রশ্ন করিলেন–"ভগবান কখন হাসেন?" কৃষক উত্তর করিল, "লোক যখন মাতৃগর্ভে যন্ত্রনা পাইতে থাকে, তখন সে এই বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, 'ভগবান, তুমি আমাকে এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া দাও, জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তোমার সেবা ও গুণকীর্তন ভিন্ন অন্য কিছু করিব না।' কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সে ঐ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া ভগবান্ ভিন্ন আর সব কিছু লইয়াই মত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ আচরণ লক্ষ্য করিয়া ভগবান হাসিতে থাকেন।" ঐ কৃষকের এই সকল উত্তর শুনিয়া

রাজা মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ কৃষকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও বাড়িয়া গেল। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "এখন আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দাও। "ভগবান কি করেন।" এই প্রশ্ন শুনিয়া কৃষক বলিল, "মহারাজ, যদি এ প্রশ্নের উত্তর শুনিতে চান তবে আপনাকে আমার কথামত কাজ করিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি, বল আমাকে কি করিতে হইবে?" ঐ কৃষক বলিল, "মহারাজ, আপনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আমার জায়গায় বসুন, আর আমি গিয়া ঐ সিংহাসনে বসি।" রাজা কৃষকের জ্ঞান দেখিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাহার কথামত কাজ করিতে এইটুকুও দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া কৃষকের স্থান অধিকার করিলেন আর কৃষক গিয়া সিংহাসনের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেলে রাজা কৃষককে বলিলেন, "কই তুমিত আমার চতুর্থ প্রশ্নের জবাব দিলে না?" কৃষক হাসিয়া বলিল, "মহারাজ, জবাব ত কার্য্যদ্বারাই কহিয়াছি। ভগবান চাষাকে রাজা করেন এবং রাজাকে চাষা করেন।" (সকলের হাস্য)

এই গল্প বলিয়া মা বলিলেন, "বাস্তবিক ভগবান ঐরূপই করিয়া থাকেন। ভাঙ্গাগড়া তাঁহারই কাজ। আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই, দেখ না, তোমাদের বাংলাদেশ রাতারাতির মধ্যে পাকিস্তান হইয়া গেল। এইরূপ যে হইতে পারে তাহাকি তোমরা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলে? (সকলের হাস্য)

এদিকে বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শ্রীমতী উদাস মাকে ডাকিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মা তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেলেন।

গান

"প্রাণের ঠাকুর"

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়

সুর - রাগ তোড়ী
তাল - রূপক/তেওড়া

আস্থায়ী : - তুমি মাগো প্রাণের ঠাকুর মোর-
তোমার চরণে প্রাণ সঁপি মাগো ধন্য জীবনমোর।

অন্তরা : - আমার প্রাণে আমার গানে সকল কাজে সকল খানে
তোমার ছোঁয়ার পরশ পাই মাগো ঝরে আঁখি লোর

আভোগ : - সারাজীবন তুমি আমায় করো কৃপাধন্য,
বুঝতে নারি মাগো তোমার মহিমা অনন্য।

সঞ্চারী : - সর্ব্বজীবের তুমি ধাত্রী জনে জনে সিদ্ধি দাত্রী,
তোমার পায়ে জীবন দিয়ে জীবন পেলাম মোর।

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে

—মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

বৌদ্ধধর্মে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই দুইটি মত প্রচলিত। এই দুইটি মত উত্তরোত্তর অধিক স্পষ্ট হয়েছে। প্রথম–মলিন বাসনা ক্ষয়ের সিদ্ধান্ত। ইহার স্বাভাবিক ফল মুক্তি অথবা নির্বাণ। দ্বিতীয়–বাসনার শোধন। ইহাতে শুদ্ধ বাসনার আবির্ভাব হয় এবং দেহশুদ্ধি ঘটে। দেহ–শুদ্ধির দ্বারা বিশ্ব-কল্যাণ তথা লোক-কল্যাণের সম্পাদন করা যেতে পারে। প্রথমটিতে শুদ্ধ-বাসনাও থাকে না, উহারও ক্ষয় হয়ে যায় এবং তাহাতে পূর্ণত্বলাভ হয়। ইহাকে ঐসব লোক বুদ্ধত্ব বলেন। ইহাকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে পরামুক্তি বলা যায়। উপরোক্ত দুই স্থিতিতে অনেক মতভেদ। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম–আদর্শ হীনযানের এবং দ্বিতীয়–মহাযানের। তবে ইহাও সত্য যে হীনযানেও মহাযানের সূক্ষ্ম বীজ নিহিত ছিল। শ্রাবকগণ আপন ব্যক্তিগত দুঃখের নাশ অথবা নির্বাণ চাইতেন। 'প্রত্যেক' বুদ্ধের লক্ষ্য দুঃখ নাশ তথা ব্যক্তিগত বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। ইহার অর্থ, স্বয়ং বুদ্ধত্ব লাভ করে বিশ্বের দুঃখনিবৃত্তিতে সহায়তা করা।

প্রাচীনকালে দশ সংযোজনের বিনাশ করে অর্হত্বপ্রাপ্তি করা লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে জীবনমুক্তির আদর্শ বলা চলে। বৌদ্ধমতে ইহাও একপ্রকারের নির্বাণ। ইহাকে সোপাধিশেষ নির্বাণ বলা হয়। এরপরে স্কন্দনিবৃত্তি অর্থাৎ দেহপাত হলে অনুপধিশেষ নির্বাণ অথবা বিদেহ কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। এই পথে ক্লেশই অজ্ঞানের স্বরূপ। পাতঞ্জল যোগদর্শনে যেমন অবিদ্যাকে মূল ক্লেশ মানা হয় তেমনি প্রাচীন বৌদ্ধদের মধ্যে ক্লেশনিবৃত্তিকেই মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ বলা হতো। বস্তুতঃ ক্লেশনিবৃত্তি হয়ে গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাসনার সর্বথা নিবৃত্তি হতো না, কেননা মলিন বাসনার নাশ হলেও শুদ্ধ বাসনার সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে সন্দেহ নেই যাহার শুদ্ধ বাসনা নেই তারপক্ষে ক্লেশ-নিবৃত্তিই চরম লক্ষ্য।

কিন্তু পূর্ণত্ব অথবা বুদ্ধত্বের আদর্শ ইহা থেকেও অনেক উচ্চে। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য কেহ বুদ্ধত্ব-লাভ করতে পারে না। শুদ্ধ বাসনা বস্তুতঃ পরার্থ-বাসনা। বোধিসত্ত্ব এই বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রমশঃ বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত করার অধিকারী হয়। বোধিসত্ত্ব'র অবস্থাও একপ্রকারের অজ্ঞানের অবস্থা। পরন্তু ইহা ক্লিষ্ট নয়, অক্লিষ্ট। বোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি ক্রমশঃ ভেদ করে অগ্রসর হতে হয়। এইপ্রকারে ক্রমশঃ শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হয়। বোধিসত্ত্বের অন্তিম অবস্থায় বুদ্ধত্বের বিকাশ হয়, যেমন আগম মতে শুদ্ধ অধ্বায় সঞ্চরণ করতে করতে জীবের মধ্যে ক্রমশঃ শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু যতক্ষণ চিদ্রূপাশক্তির অভিব্যক্তি না হয় ততক্ষণ বা ততদিন শিবত্বের আভাস দেখা দিলেও শিবত্বের সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না, এমনকি বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান কৈবল্যরূপ স্থিতিতে অবস্থিত হলেও পূর্ণ শিবত্ব লাভ হয় না।

ঠিক এইপ্রকার বোধিসত্ত্বের অবস্থা দশ অথবা ততোধিক ভূমিতে বিভক্ত। 'ভূমি প্রবিষ্ট প্রজ্ঞা'র বিকাশ হতে হতে অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং অন্তিম অবস্থায় পূর্ণাভিষেকের প্রাপ্তি হয়। ঐ সময় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপদে অধিরূঢ় হয়। বুদ্ধত্ব অদ্বয়স্থিতির বাচক। পুদ্গল–নৈরাত্ম্য সিদ্ধ হলে বুঝতে হবে ক্লেশ-নিবৃত্তি হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বৈতের ভান থেকে যায়। এরজন্য ধর্ম–নৈরাত্ম্য হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হলে ধর্ম-নৈরাত্ম্যের সিদ্ধি হয়ে যায়। ঐ সময় নৈরাত্ম্যদৃষ্টিতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সমরস হয়ে যায়। ইহাই পূর্ণ নৈরাত্ম্য। বৈদিক তথা আগমিক আদর্শে বাহ্যদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ভেদ প্রতীত হয়। ইহা এমন ভেদ

যেমন Old Testament এবং New Testament-এ Law (বিধি) তথা Love (প্রেম) এই লক্ষ্যের আধারে কিঞ্চিৎ ভেদ প্রতীত হয়।

বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রাচীন সময়েও ছিল। জনতার জন্য বুদ্ধ হওয়া আপাততঃ সহজ ছিল না, কিন্তু অর্হৎ-পদে উত্থিত হয়ে নির্বাণ-লাভ করা-অর্থাৎ দুঃখের উপশম করা, সবারই অভীষ্ট ছিল। কিন্তু যে স্থিতিতে নিজের এবং অন্যের দুঃখে সমান প্রতীত হয় এবং আপন সত্তার বোধ বিশ্বব্যাপী হয়ে যায় ঐ সময় সবার দুঃখ-নিবৃত্তিই আপন দুঃখের নিবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায়। ক্লিষ্ট বাসনার উপশমে যে নির্বাণ পাওয়া যায় উহা যথার্থ নয়। মহানির্বাণপ্রাপ্তির পূর্বে সাধককে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হয়ে ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমি সকলকে অতিক্রম করতে হয়। ক্রমবিকাশের এই পথে কারও কারও শত-শত জন্ম কেটে যায়।

সাংখ্য-যোগের পথে যেমন বিবেকখ্যাতি ও বিবেকজজ্ঞানের ভেদ দৃষ্টিগত হয়, ঠিক তেমনি শ্রুত-চিন্তা-ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা ও ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞার ভেদ লক্ষিত হয়। বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের কারণ, পরন্তু বিবেকজজ্ঞান কৈবল্যের অবিরোধী ঈশ্বরতত্ত্বের সাধক। ঈশ্বরত্বের ভূমি পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষ উঠতে পারে না। কিন্তু বিবেকজজ্ঞান প্রাপ্ত করার পর কৈবল্যপ্রাপ্তির অধিকার সবারই মিলতে পারে। বিবেকজজ্ঞান তারক, অক্রম, সবিষয়ক, সর্বথা বিষয়ক তথা অনৌপদেশিক। অর্থাৎ ইহা প্রাতিভ জ্ঞান অথবা স্বয়ংসিদ্ধ মহাজ্ঞান। ইহা সর্বজ্ঞত্ব, কিন্তু কৈবল্যস্থিতি নয়। যোগভাষ্যে বলা হয়েছে সত্ত্ব এবং পুরুষের সমরূপে, সমানতালে উভয়ের শুদ্ধি হয়ে গেলে কৈবল্য-লাভ হয়, কিন্তু বিবেকজজ্ঞানের প্রাপ্তি অথবা ঈশ্বর-লাভ হোক্ অথবা না হোক্-ইহার সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নেই।

জৈন মতেও সেইরূপ কৈবল্য-জ্ঞান সবাই পেতে পারে, কিন্তু তীর্থংকরত্ব সবার জন্য নয়। তীর্থংকর গুরু তথা দৈশিক। এই পদে ব্যক্তি-বিশেষই যেতে পারে, সবাই নয়। তীর্থংকরত্ব ত্রয়োদশ গুণস্থানে প্রকট হয়, কিন্তু সিদ্ধাবস্থার প্রাপ্তি চতুর্দশভূমিতে হয়।

দ্বৈত শৈবাগমে যোগী শুদ্ধ অধ্বায় প্রবিষ্ট হবার পর ক্রমশঃ তাঁর শুদ্ধ অধিকার-বাসনা এবং শুদ্ধ ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়ে যায়। এই দুইই শুদ্ধ অবস্থার দ্যোতক। এরপরে লয়াবস্থায় শুদ্ধভাবেরও অভাবে শিবত্বের উদয় হয়। অধিকার-বাসনা তথা ভোগ-বাসনা অশুদ্ধ নয়, কিন্তু ইহারও নিবৃত্তি আবশ্যক। অধিকারাবস্থাই শান্তার পদ। শুদ্ধবিদ্যায় অধিষ্ঠাতা হয়ে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন জগতে জ্ঞানদান করা তথা জীব এবং জগৎকে শুদ্ধ অধ্বায় আকর্ষিত করা-ইহাই বিদ্যেশ্বরগণের কার্য্য। ইহা বিশুদ্ধ পরোপকার। এই বাসনার ক্ষয় হলে শুদ্ধ ভোগ হতে পারে, কিন্তু ইহার জন্য বাসনা থাকা আবশ্যক। এইপ্রকার ঈশ্বরত্ব থেকে সদাশিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত আরোহণ হয়। যখন শুদ্ধ আনন্দ থেকেও বৈরাগ্য হবে তখন অন্তর্লীন অবস্থাভূত শিবত্বের স্ফুরণ হবে। কিন্তু ইহাতে উপাধি থাকে। এরপরে নিরুপাধিক শিবত্ব লাভ হয়। উহাতে ব্যক্তিত্ব থাকে না, কেননা শুদ্ধ বাসনার ক্ষয় হলে পর ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না। ঐ সময় মহামায়া থেকেও পূর্ণ মুক্তি মিলে যায়। অদ্বৈত শৈবাগমেও ভগবদ্ অনুগ্রহের প্রভাবেই শুদ্ধমার্গে প্রবেশ হয়, পরে পরমশিবত্বের স্থিতির ক্রমশঃ বিকাশ হয়। দীক্ষারও যথার্থ রহস্য ইহাই। ইহাতে পাশক্ষয় এবং শিবত্ব-যোজন দুইই লাভ হয়।

প্রাচীনকালে বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রত্যেক জীবের ছিল না। ইহা কোন কোন উচ্চাধিকারীর ছিল। এর জন্য তাঁদের বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন প্রকারের সংঘর্ষণের প্রভাবে জীবনের উৎকর্ষের সাধনা করতে হয়েছিল। এই সাধনাকে পারমিতার সাধনা বলা হয়। পুণ্যসম্ভার তথা জ্ঞান-সম্ভার দুই থেকেই বুদ্ধত্ব নিষ্পন্ন হয়।

পুণ্য-সম্ভার কর্মাত্মক, জ্ঞান-সম্ভার প্রজ্ঞাত্মক। এই দুইয়েরই উপযোগিতা ছিল। অদ্বৈতভাবের বিস্তারের সাথে সাথে বুদ্ধত্বের আদর্শ ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে গোত্রভেদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হতো। কিন্তু লক্ষ্য বড় হওয়ার দরুণ ইহা ক্রমশঃ উপেক্ষিত হতে লাগল। অভিনব দৃষ্টির অনুসারে বুদ্ধ-বীজ সবার ভিতরে আছে। পরন্তু একমাত্র মনুষ্য-দেহেরই ইহা বৈশিষ্ট্য, এখানে অঙ্কুরিত হয়ে বিকশিত হতে পারে, তখনই বুদ্ধত্ব-লাভ হতে পারে। যে সময় থেকে বুদ্ধত্বের আদর্শের প্রসার হয়েছিল, ঐ সময় থেকে বোধিসত্ত্বের চর্যা আবশ্যক প্রতীত হতে লাগল। এই অবস্থায় নির্বাণের প্রাচীন আদর্শ মলিন হয়ে গেল এবং ইহাই আদর্শ মহানির্বাণ অথবা মহাপরিনির্বাণের রূপে পরিণত হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

গান

—শ্রী নলিনী কান্ত ভট্টাচার্য

মা যেন চরণকমলে মন রাজে
কোমল নয়ন ঢল ঢল বদন
কথায় মৃদুল মধুভাষে
মা যেন - - - - - রাজে।
নবনী ছানিয়া তনু মরালগমন,
চরণেতে কোটি শশী শোভে
ত্রিলোক জিনিয়া হাসি
পরাণে লাগায় ফাঁসি
দিবানিশি মনোবীণা বাজে
মা যেন - - - - - - রাজে
আসে কত গৃহবাসী লয়ে জায়া পরিজন
উদাসী সন্ন্যাসী আসি, ফিরে না করে গমন
পূজা পাঠ ভেসে যায় চরণে শরণ চায়
রসের সাগরে সবে দিবানিশি ভাসে
মা যেন চরণ কমলে মন রাজে।

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভে মা আসেন ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী। ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত মা ছিলেন ত্রিবেনীক্ষেত্রে। ১৪ই ও ২১শে জানুয়ারীর পুণ্য স্নানের দুটি তিথিতেই উপস্থিত ছিলেন। এই কুম্ভমেলার পর ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে অর্ধকুম্ভমেলায় মা উপস্থিত হয়েছিলেন। মেলা প্রাঙ্গণে মা আনন্দময়ী আশ্রমে ক্যাম্প খোলা হয়েছিল ১০ই জানুয়ারীর আগে থেকে। এই তারিখ থেকেই আশ্রমবাসী মহিলারা একমাসব্যাপী 'কল্পবাস' ব্রত পালন করেছিলেন। মাকে ঘিরে যেমন খ্যাত–অখ্যাতব্যক্তিদের ভীড়—তেমনি সাধু-মহাত্মাদেরও।

১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার প্রথম শোভাযাত্রায় মাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষভাবে। মা যথাবিধি গঙ্গায় নেমে জলস্পর্শ করেন এবং সকলকে সস্নেহ জলস্পর্শে ধন্য করেন।

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণকুম্ভে মায়ের দিব্য অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী লেখক হিসামে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ তাঁর 'কুম্ভমেলায়' গ্রন্থে। মাতৃ-প্রসঙ্গে তিনি আবেগ-আকুল। কুম্ভমেলায় গিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়েছেন কুম্ভমেলার যর্থাথ হৃৎ-স্পন্দন অনুভব করার জন্য।

"ভিড় ঠেলে সঙ্গম মার্গের মোড়ে আসি। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেন, "কোন দিকে যাবি?"

আমি উত্তর দেবার আগেই কাকু আমাকে বলে, "চল্, আনন্দময়ী মায়ের ক্যাম্পে যাই। মা নাকি আজ দশটায় দর্শন দান করবেন।"

কাকু ভক্ত মানুষ, সে বলতেই পারে। কিন্তু আমাদের দলের একমাত্র আধুনিকা শঙ্করীও সেই একই কথা বলে, "তাই ভাল। চলুন মা-কে দর্শন করা যাক।"

অতএব এগিয়ে এসে মায়ের ক্যাম্পে প্রবেশ করি। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়ে ডানদিকে মন্দির। অনেকটা জায়গা নিয়ে অস্থায়ী মন্দির-টিনের ছাউনি। অপরপ্রান্তে মঞ্চের ওপর রাম-সীতার মূর্তি। পাশে আরকটি ছোট মঞ্চ। এখন খালি পড়ে আছে। তারপর থেকে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে সতরঞ্জি পাতা। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের বহু নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা বসে রয়েছে। কয়েকজন শিষ্যা মধুর স্বরে ভজন গাইছেন। ভক্তবৃন্দ সমাহিত হয়ে সেই গান শুনছেন। শুনছেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী। তাঁরাও শান্ত এবং সমাহিত। তাঁরা হয়তো ভাষা বুঝছেন না, কিন্তু সুরের মাহাত্ম্যটি হৃদয়ে অনুভব করছেন। ভাষা আঞ্চলিক—কিন্তু সুর সর্বজনীন।

আমরাও সবার সঙ্গে বসে পড়ি। আর তখুনি ওরা এসে হাজির হলো। দুটি শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী। সাহেবের কাঁধে দু'টি ক্যামেরা আর মেমসাহেবের হাতে একটা টেপ্-রেকর্ডার।

একটু বাদে সাহেব ছবি নিতে শুরু করলেন আর মেমসাহেব আমাদের পাশে এসে বসে পড়লেন। সামনে থেকে দেখছি বলেই মেমসাহেব বলতে পারছি, নইলে তাঁর উচ্চতা, স্বাস্থ্য ও পোশাক কোনটাই নারীসুলভ নয়।

১. কুম্ভমেলায়–শঙ্কু মহারাজ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ (১৯৮৯) পৃঃ ৬৩-৬৪

২. তদেব, পৃঃ ৬৮-৬৯

ভজন শেষ হয়, কিন্তু নীরবতা নষ্ট হয় না। সারা মন্দির জুড়ে বিরাজ করছে এক অনির্বচনীয় নীরবতা। অথচ এখানে বেশ কিছু ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে এসেছে তাদের বাপ-মায়ের সঙ্গে। তারাও যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুবলে দুষ্টুমি ভুলে শান্ত ও সংযত হয়ে গিয়েছে।

কয়েক শ' মানুষ এক পরমলগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা মায়ের দর্শন পাবার আশায় রয়েছেন। কলির ভগবতী মা-আনন্দময়ীকে দর্শন করার জন্য আমরা আকুল হয়ে বসে রয়েছি।

মা এলেন। স্মিত হাসিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে মা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর গায়ে একখানি সাদা চাদর, চোখে চশমা। এখনও তাঁর কেশরাশি তেমনি কৃষ্ণকালো। মায়ের মুখে পরম প্রশান্তি, ঠোঁটে করুণার হাসি।

কেউ ছবি তুলছেন, কেউ ফুল ও মালা দিচ্ছেন। মা সানন্দে গ্রহণ করছেন সকলের সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন মন্দিরের দিকে। আমরা নতমস্তকে প্রণাম করি মা-অন্নপূর্ণাকে। তারপরে মনে মনে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি—মা, তুমি আমাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত কর। আমি যেন সৎ জীবন যাপন করতে পরি।

রাম-সীতার পাশে সেই মঞ্চটিতে গিয়ে মা বসে পড়লেন। তারপরে হাত তুলে আবার আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

একটু বাদে একজন উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসার এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মাকে প্রণাম করে উঠে দু'হাত জড়ো করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তারপরে সবিনয়ে বললেন—মা! আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, না, অসুবিধে হবে কেন? এবার তো মেলায় খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। মা প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন।

পুলিস অফিসার বলেন—সব আপনার আশীর্বাদ, মা!

—না, না, আমার আশীর্বাদ কেন হতে যাবে? সবই তাঁর করুণা। মা, ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ বোজেন।

—মা!

মা পুলিস অফিসারের দিকে তাকান। পুলিশ অফিসার আবার বলেন—মা, আপনি কৃপা করুন মা! আর চার-পাঁচটা দিন যেন বৃষ্টি না হয়।

হঠাৎ কেন যেন মায়ের মুখে হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। তিনি একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপরে গম্ভীরস্বরে বললেন—সবাই মিলে তাঁকে ডাকো। তিনি করুণাময়। তাঁর কৃপা হলে আবহাওয়া নিশ্চয়ই ভাল থাকবে।

আবার মাকে প্রণাম করে পুলিশ অফিসার খুশি মনে বিদায় নিলেন। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মা হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন! কেন ওভাবে বললেন কথাটা? তাঁর কৃপা হলে ......। তার মানে কি এই যে তাঁর কৃপা নাও হতে পারে? কিন্তু এই রৌদ্রস্নাত শীতের সকালে বৃষ্টির ভয় করা কেন? এখানে এখন বৃষ্টি হলে লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতির শেষ থাকবে না সত্য, তবে এই মেঘমুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে সে দুশ্চিন্তা খুবই অমূলক নয় কি?"

এরপর মাতৃ-প্রণামের বিচিত্র অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে লেখকের বর্ণনায়। মীরার ভজনে মুগ্ধ সমাগত জনতার কথা লেখক সানন্দে বর্ণনা করেছেন এবং এরই মাঝখানে ধরা পড়েছে তাঁর এক পাঠিকার বিমুগ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই পাঠিকা আর কেউ নন তিনি মাতৃস্নেহে অভিষিক্তা ব্রহ্মচারিণী চিত্রা ঘোষ।

"ওঁরা যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসছেন তখনই লেখকের কানে আসে,—শুনছেন! একটু শুনুন! ...... তাড়াতাড়ি পিছন ফিরি।

একজন ভদ্রমহিলা প্রায় ছুটে আসছেন। হাত নেড়ে তিনি আমাদের থামতে বলছেন। তার পরনে সাদা জামা-কাপড়, ব্রহ্মচারিণীর বেশ।

তিনি কাছে আসেন। ভদ্রমহিলা কালো না হলেও খুব ফর্সা নন, সুশ্রী হলেও সুন্দরী নন। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে স্বর্গীয় সুষমা আর চোখ দুটিতে নক্ষত্রের দীপ্তি। মনে হচ্ছে আশ্রমবাসিনী।"

অবশেষে মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় শঙ্কু মহারাজের (বলা বাহুল্য, নামটি ছদ্মনাম)—

লেখকের কথায়—"ব্রহ্মচারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি সঙ্গীদের কাছে। সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। কিন্তু মনে মনে আশ্রমবাসিনীর কথাই ভাবতে থাকি। কে এই ব্রহ্মচারিণী? ইনিই কি সেই ঈশান স্কলার শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ, যিনি আমার বই পড়তে খুব ভালবাসেন? গোরাদা বলেছেন, ভদ্রমহিলা আই০এ০ তে ফিফ্‌থ এবং এম্‌০এ০তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন। স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পি০এইচ০ডি০ করতে যান। কিন্তু মা আনন্দময়ীর ডাকে দেশে ফিরে আসেন। সেই থেকে মায়ের কাছে আছেন। হিমালয় সহ তিনি ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো একজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সাত্ত্বিক সাধিকা আমার মানসীকে ভালবেসে ফেলেছেন। এই কুম্ভমেলায় মানসীর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি খুশি হবেন! কি জানি? সংসারে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

তবে আমার মতো একজন নগণ্য লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

হে তীর্থরাজ প্রয়াগ, তোমার অসীম করুণা। তোমার এই পুণ্যক্ষেত্রে প্রথম দিনেই তুমি আমাকে পরমানন্দ প্রদান করলে! পূর্ণকুম্ভের হে আনন্দস্বরূপ পুণ্যপ্রয়াগ, তোমাকে প্রণাম-শত-সহস্র প্রণাম।"

কুম্ভমেলায় অমৃতময় পথপরিক্রমায় লেখকের অমৃতলাভ হয়েছে নিঃসন্দেহে। এই অমৃত নানা ধারায় নানাজনের হৃদয়কুম্ভে সঞ্চিত হয়েছে। লেখকের সহযাত্রিণী শংকরীদেবীর মনে প্রশ্ন জেগেছে,—এই রৌদ্রস্নাত দিনমানে বর্ষণের কথা পুলিশ অফিসারের মনে আসার তবু অর্থ হয়, তিনি সকল সম্ভাবনার কথা ভাবছেন। কিন্তু মা কেন শুধু করুণ-প্রার্থনার কথাই বললেন? তবে কি বর্ষণ হবেই? তা হলে অগণিত নরনারীর কষ্টের শেষ থাকবে না। "মা যে শুধু অন্নপূর্ণা নন, তিনি অন্তর্যামিনী। তাই তিনি সবাইকে সর্বশক্তিমানের কাছে করুণা প্রার্থনা করতে বলেছেন।"

সত্য সত্যই বর্ষণ এলো। যেমন বর্ষণ, তেমনি মাঘ মাসের হাড় কাঁপানো শীত। এই আশাতীত অশ্রান্ত বর্ষণে স্নানার্থীদের কষ্টের অবধি নেই। রাত্রিতে যাঁরা বেরিয়েছেন তাঁরা স্নান সেরে ফিরে এলেন ভোর ছটায়। সাড়ে ছটায় লেখক তার সহযাত্রীদের নিয়ে স্নানের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেনে। পথের কষ্ট পরাজিত হয়েছে অমৃতস্নানে হৃদয়-কুম্ভের পূর্ণতায়। তারপর পুনর্বার লেখক বেরিয়েছেন কুম্ভমেলার ছবিকে হৃদয়ের পর্দায় ধরবার জন্য। ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বেরিয়ে শিবিরের পথে মা আনন্দময়ী আশ্রমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লেখকের সঙ্গে পুনর্বার দেখা হয় ব্রহ্মচারিণী চিত্রাজীর। 'এই যে মহারাজ! বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?' কথা প্রসঙ্গে লেখককে স্বীকার করতে হয় সাধুদের স্নান এবং মায়ের স্নানযাত্রা দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি। তখন ব্রহ্মচারিণী মায়ের শোভাযাত্রা তথা স্নানযাত্রার যে অপরূপ চিত্র রচনা করেছেন তার তুলনা নাই। সেই স্নানযাত্রার পুণ্যকথা অপরিমেয় আনন্দের নিত্য-নির্ঝর।

"তাহলে একটু বলুন না সেই স্নানযাত্রার কথা। শুনে ধন্য হই।"

"বেশ বলছি।" ব্রহ্মচারিণী আরম্ভ করেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ১৯৭৪ সালে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে নির্বাণী আখড়ার তরফ থেকে মাকে হাতীর পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার নির্বাণী আখড়া প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা মাকে তিনটি স্নানেই শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবেন।"

ব্রহ্মচারিণী সহসা থেমে যান। তিনি আমার দিকে তাকান।

আমি বলি, "বুঝতে পেরেছি। তিনটি স্নান মানে মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা ও শ্রীপঞ্চমীর স্নান। আপনি বলুন।"

ব্রহ্মচারিণী শুরু করেন, "আপনি জানেন, আমাদের দিদিমা অর্থাৎ মায়ের গর্ভধারিণী মা শ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী কিছুদিন হল অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন?"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নেড়ে বলি, "বন পরিক্রমার সময় বৃন্দাবনে দিদিমাকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছে আমার! তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাও বলেছি।"

"দিদিমার সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ মঙ্গলগিরিজী নির্বাণী আখড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই নির্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসীরা মাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। এদিকে নির্বাণী আখড়ার মোহন্তজী শ্রীশ্রীগিরিনারায়ণজীও মাকে খুব ভক্তি করেন। তিনি বললেন—মায়ের কুম্ভমেলায় প্রবেশের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা তাঁর আখড়া থেকে করা হবে এবং স্নানযাত্রার আয়োজনও করবেন নির্বাণী আখড়া।"

একবার থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "গতকাল ঐ ঝড়-বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যেও আমরা রাত আড়াইটেয় ঘুম থেকে উঠে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করেছি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মার কুটিয়াতে ঢুকে দেখি, মাও প্রস্তুত। মা নিজ হাতে আমাদের সবাইকে একখানি করে হলুদ রুমাল দিয়ে মাথায় বেঁধে নিতে বললেন। আমরা যাতে ভিড়ের মাঝে দলছাড়া না হয়ে যাই, তাই মার এই ব্যবস্থা।

"এই সময় কন্যাপীঠের একটি মেয়ে ছুটে এসে মাকে বলল—মা বাইরে বড্ড বৃষ্টি। একটু না কমলে বেরুবো কেমন করে? বৃষ্টিটা কমাও!

"মা মৃদু হেসে বললেন—দেখ, তোমাদের বাক্য যদি সিদ্ধ হয়।

"সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটল। সত্যি সত্যি সহসা বৃষ্টিটা বেশ কমে গেল। মা ক্যাম্প থেকে বের হয়ে মোটরে উঠলেন। ভোর ছ'টায় নির্বাণী আখড়ায় পৌঁছলেন। সেখানে ফুল ও মালা দিয়ে একটি পাল্কী সাজানো হয়েছিল। পাল্কীর ওপরে প্রায় একতলার সমান উঁচু একটা রূপোর সিংহাসন। মা নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।

"মায়ের পরনে সরু হলুদপাড় সাদা গরদ, গলায় রজনীগন্ধা ও শোলার মালা। স্মিত হাসিতে মার শ্রীমুখ উদ্‌ভাসিত। বেদধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত।

"মায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা কাশ্মীরী মেয়ে দুহিতা উদাসজী মার পায়ের কাছে বসলেন। প্রবীন সাধু স্বামী পরমানন্দজী বসলেন মায়ের পেছনে। আর রূপোর ঝলক দেওয়া বিরাট সাদা স্যাটিনের ছাতা নিয়ে পরমানন্দজীর পাশে দাঁড়ালেন ভাস্করানন্দজী। ১৯৭৪ সালে পূর্ণকুম্ভে ত্রিবেন্দ্রামের মহারাজা মাকে এই ছত্রটি দিয়েছেন।

"আমরা ব্রহ্মচারিণীরা ছিলাম মায়ের ডানপাশে। কীর্তনীয়া কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল আমাদের মধ্যে। আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ ছিলেন মায়ের বাঁদিকে। আর মার সামনে রূপোর সিংহাসনে নারায়ণ বিগ্রহ। আমাদের সংঘের সেক্রেটারী স্বামী স্বরূপানন্দজী সুষ্ঠুভাবে শোভাযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন।

"শোভাযাত্রার সামনে ছিল কীর্তনপার্টির ছেলেরা। খোল-করতাল বাজিয়ে তারা গান ধরল—'হর হর মহাদেব, ব্রহ্মময় কুম্ভজল......।' আমরা মায়ের মেয়েরাও গেয়ে উঠলাম—'আনন্দময় কুম্ভজল।' মা তাঁর ডানহাত খানি তুলে তাল দিতে থাকলেন। শুরু হল স্নানযাত্রা।"

"মায়ের ঠিক পেছনে নিরঞ্জনী আখড়ার মহামন্ডলেশ্বরী যোগশক্তি মায়ের পাল্কী, তাঁর পেছনে আরও কয়েকজন মন্ডলেশ্বরের পাল্কী। আর সবার আগে আমাদের ধ্বজা ও ত্রিশুল—কমন্ডলুসহ ব্রহ্মচারী দাশু এবং সারা ভারতের নাগা সন্ন্যাসিগণ। সব মিলিয়ে সে এক অপরূপ স্বর্গীয় পরিবেশ।

"কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। মাঝে মাঝেই পা ডুবে যাচ্ছে। মাঘের শীত, যেমন বৃষ্টি তেমনি বাতাস। কিন্তু আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা, কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি —

ভজ মা-আনন্দময়ী, গাহ মা আনন্দময়ী ....
প্রভাতে মায়ের নাম ভজিলে আনন্দধাম,
আনন্দে মার নাম গাওরে।'

"কীর্তনের শব্দে বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ হারিয়ে গেছে। মায়ের নামগানে সারা কুম্ভনগর মুখরিত। মাতৃদর্শনের

আকাঙ্খায় লক্ষ লক্ষ নরনারী শেষরাত থেকে পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মায়ের পাল্কী দেখামাত্র সেই জনসমুদ্রে ঢেউ ওঠে। সবাই একসঙ্গে শ্রীমায়ের শ্রীমুখখানি দর্শন করতে চান। সেকি আকুলতা, কী ব্যাকুলতা। শীত বৃষ্টি ও বাতাস উপেক্ষা করে তাঁরা ঘন্টার পর ঘন্টা প্রতীক্ষা করছেন। সেই প্রতীক্ষা সার্থক হল।

"তাঁরা যেমন মাকে দর্শন করেন, মাও তাঁদের দেখেন। আমাদের বলেন—জনজনার্দনের এই বিরাট রূপ তোরাও বহুপুণ্যে দর্শন করলি।

"কেবল ভারতীয় ভক্তরাই নন, বহু বিদেশী পর্যটক মায়ের সেই ভুবন ভোলানো জগন্মোহিনী রূপ দর্শন করে মোহিত হচ্ছিলেন। বার বার তাঁদের ফ্ল্যাশ ক্যামেরা থেকে আলোর ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মাকে দর্শন করা ও মায়ের ছবি নেবার জন্য তাঁরাও সমানে জল-কাদা ভেঙ্গে ছুটোছুটি করছিলেন।

"অবশেষে সঙ্গম ঘাটের কাছে পৌঁছে মায়ের পাল্কী দাঁড় করানো হল। পাল্কী থেকে নেমে মা হেঁটে সঙ্গম অবধি গেলেন। তিনি গঙ্গায় অবতরণ করলেন। স্বহস্তে গঙ্গাবারি নিয়ে মাথায় দিলেন।"

"মায়ের পরে নাগাসন্ন্যাসীরা ও অন্যান্য সব সাধু-মহাত্মারা পুণ্যস্নানে নামলেন। সবশেষে আমরা মেয়েরাও অমৃত লাভ করলাম। আমি মায়ের চরণামৃতময় কুম্ভবারি শিশিতে সঞ্চয় করে উঠে এলাম তীরে। মায়ের পাল্কীর পাশে এসে দাঁড়ালাম।"

"ফেরার পথে আমরা আবার নির্বাণীর আখড়ায় এলাম। মা এবং মহামন্ডলেশ্বরগণ গিয়ে মঞ্চের ওপরে উপবেশন করলেন। আরতি হল। মা তারপরে আখড়ার মন্দির দর্শন করলেন। অবশেষে মায়ের সঙ্গে আমরা সকাল আটটা নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।"

থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরেই বলে উঠলেন, এইরে, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম।"

"তাতে তো আমার ভালই হল। দেখতে না পারলেও স্বর্গীয় স্নানযাত্রার কথা শোনা হল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আসি।"

"আসুন।" ব্রহ্মচারিণী দুহাত তুলে নমস্কার করেন।

ব্রহ্মচারিণী চিত্রার প্রতি লেখকেরই শুধু নমস্কার নয়, সভক্তি নমস্কার আমার মত সাধারণ মানুষদেরও। এই অপূর্ব কথন স্বর্গীয় সুষমায় পূর্ণ। মায়ের কুম্ভস্নানের এরূপ মধুক্ষরা বর্ষণ আর দ্বিতীয় নেই।

প্রয়াগের বুম্ভমেলায় মা বার বার এসেছেন। ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের অনুষ্ঠিত প্রায়াগের কুম্ভমেলাতে তাঁর শরীরীরূপে শেষ অবস্থান। নির্বাণী আখড়ার মোহন্তরা বিরাট শোভাযাত্রা করে মাকে নিয়ে যান মেলা প্রাঙ্গনে এবং মাকে দিয়েই এই মেলার উদ্বোধন করান তাঁরা। ১৪ই জানুয়ারী মকরসংক্রান্তির দিনেও বিরাট মিছিল করে মাকে পুরোভাগে রেখে সকলে গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থানে যান। মা জলস্পর্শ করেন এবং সকলকে সঙ্গম-বারিতে ধন্য করেন। মেলা প্রাঙ্গনে আনন্দময়ী আশ্রমের ক্যাম্পে মা ১০ই থেকে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করেন। সাধু-মহাত্মা, ভি.আই.পি. এবং সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষের জন্য মায়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত। মা সকলকেই কৃত-কৃতার্থ করেছেন। নৈমিষারণ্যের নারদানন্দ স্বামী 'মা এবং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই' এই ঘোষণা করেছিলেন।৩ প্রকৃতপক্ষে কুম্ভমেলায় মায়ের উপস্থিতি ভারতবর্ষের সাধুমহাত্মাদের আনন্দে এক স্বর্গীয় পরিবেশের রচনা ছিল সহজ-সিদ্ধ। শরীরীরূপে স্বয়ং জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রীর অবস্থান মর্তে অমর্তের প্রতিষ্ঠারই নামান্তর! তাই অধ্যাত্মজগতের দিক্‌পালগণ মহামন্ডলেশ্বরগণ, শংরাচার্যগণ সকলেই এই মাতৃ-মূর্তির বন্দনায় নিত্য-মুখর।

৩) আনন্দময়ী মায়ের কথা-ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার, ১৯৯৫) পৃঃ ১৮২

শক্তি-স্বরূপ, শক্তিরূপ : শ্রীদুর্গা

('দেবীভাগবতে'র কথা)

—ডক্টর শুকদেব সিংহ

দেবী ভাগবত গ্রন্থটি গ্রন্থকারের ভাষায় মহাপুরাণ। কিন্তু শাস্ত্রবেত্তাদের নির্ণয়ে উপ-পুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের মতো আঠারো হাজার শ্লোকেই 'দেবী ভাগবত'-ও রচনা করেছেন মহর্ষি বেদব্যাস। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন মোক্ষকামী রাজা পরীক্ষিতকে শুনিয়েছিলেন মহামুনি শুকদেব, তেমনি ব্যাসদেব স্বয়ং 'দেবী ভাগবত' শুনিয়েছিলেন ভোগ ও মোক্ষ উভয়কামী পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয়কে। ভোগ-মোক্ষ উভয়পন্থাশ্রয়ী গ্রন্থ বলে 'দেবী-ভাগবতে' মহামুনি শুকদেব আর দেবর্ষি নারদের ভোগে লিপ্ত হওয়ার অদ্ভুত কাহিনী আছে।

শুকদেবের কাহিনীটি এই রকম। শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করে ব্যাসদেব শুকদেবকে তা পড়ালেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম অতীত হলে পিতা পুত্রকে বললেন বিবাহ করতে। কিন্তু পুত্র রাজী নন। ব্যাসদেব তখন পুত্র শুকদেবকে স্ব-রচিত 'দেবীভাগবত' পড়ার নির্দেশ দিলেন। এই বইখানি পড়ায় শুকদেবের মনে কেমন অস্থিরতা এলো। পিতা পুত্রকে এবার নির্দেশ দিলেন মহারাজ জনকের সঙ্গে দেখা করতে। তাই করলেন শুকদেব। ফলে জনকের কাছে তিনি উপদেশ পেলেন। ঘরে ফিরে শুকদেব এবার বিবাহে সম্মত হলেন। তিনি বিবাহ করলেন পীবরীকে।কালে তাঁর চার পুত্র আর এক কন্যা হলো। সংসার করার পর শুকদেব গেলেন কৈলাশে। সেখানে সমাধিস্থ থেকে তিনি অনন্তে বিলীন হলেন। ব্যাসদেব পুত্রশোকে কাতর হয়ে কৈলাসে গিয়ে পুত্রকে একবার দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। শিববরে তিনি দেখলেনও পুত্রকে, তবে নির্বাক্ ছায়ারূপে।

'দেবী ভাগবতে'র ষষ্ঠস্কন্ধে রয়েছে নারদের স্ত্রীরূপ-গ্রহণের কথা। দেবর্ষি নারদ একবার স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। রাজা তালধ্বজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো। ছেলে ও নাতিপুতি হলো অনেকগুলি। তারা সব মরে যাওয়ায় প্রচন্ড শোক পেলেন নারদ। তারপর দেবীর শরণ নেওয়ায় তাঁর স্ত্রীলোক-জন্ম বিদূরিত হলো। নারদ বুঝলেন মায়া তাঁকে গ্রাস করেছিলো। বাঁচালেন মহামায়া।

এই মহামায়া মা দেবী ভগবতীর তত্ত্ব নিয়েই দেবী ভাগবত। গ্রন্থ মধ্যে বলা হয়েছে–

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাহবিকৃতা শিবা।
যোগপম্যাহখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ প্রিয়াঃ॥

(দেবীভাগবত–১।২।১৯-২০)

অর্থাৎ-যিনি নির্গুণা, তিনি সর্বদাই বিরাজমান। (দেশ-কাল ও বস্তুর সীমা অতিক্রম করে) যিনি সর্ব-বিস্তৃতা, বিকারবিহীনা ও মহালক্ষ্মী, যোগেই যাঁকে পাওয়া যায়, যিনি বিশ্বের আশ্রয় আর শূন্যে সংস্থিতা, তাঁর (সেই দেবীর) সাত্ত্বিকী, রাদসী ও তাপসী শক্তি মহালক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহাকালী নামে

ত্রিবিধা।

পালন, সৃষ্টি ও ধ্বংস শক্তির স্ফুরণ এই তিনটি ক্ষেত্রেই। তাই মহাশক্তি ভগবতী সাত্ত্বিকী সত্তায় মহালক্ষ্মী, সব কিছুকে পালন বা রক্ষা করেন। তিনি রাজসী বা রাজসিকী সত্তায় সরস্বতী, সৃষ্টি করেন। আর তামসী ধারিনী মহাকালী রূপে করেন সংহার বা ধ্বংস।

মহালক্ষ্মীর মধ্যে পালনের কথা বড় বলে পালন-অধিকর্তা বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ। সরস্বতীর মধ্যে সৃষ্টি বড় বলে স্রষ্টা ব্রহ্মার সঙ্গেই তাঁর উদ্বাহ। আর তামসী শক্তিধারিনী মহাকালী রুদ্র-শিবের সঙ্গে অন্বিতা, কারণ দুয়ের ক্ষেত্রেই ধ্বংস প্রধান কাজ।

দেবী ভাগবতে দেবীর চরিত্র পাঁচটি প্রসঙ্গে সুব্যক্ত–

(১) মধু-কৈটভ বধ (২) মহিষাসুর বধ (৩) চন্ড-মুন্ড বধ (৪) ধূম্রলোচন বধ (৫) শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

মধু-কৈটভ বধের বৃত্তান্ত আছে 'দেবী ভাগবতে'র ১ম স্কন্ধে। অন্য চারটি পঞ্চম স্কন্ধে।

'মার্কন্ডেয় চন্ডী'তে দেবী মহাকালী রূপে মধু কৈটভ নিধনের কারণ হয়েছেন। সে বৃত্তান্ত আমরা চন্ডী আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করেছি। এখানে সংযোজনের মধ্যে এই-শ্রুতি-বিরোধী অর্থাৎ বেদ-বিরোধী ভাবেই তাদের উদ্ভব, তাই কর্ণমলের প্রসঙ্গ।

মধু-কৈটভ আহার-বিহার রূপ প্রবণতার প্রতীক। এ গুলি মাথা তুলে দাঁড়ায় তামসিকতার প্রাবল্যে। কিন্তু বিষ্ণুকে জাগালে অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শক্তির পুনর্জাগরণ ঘটলে আহার-বিহার রূপ প্রবণতা হয় বিনষ্ট।

ভগবতীর পরবর্তী কাজ মহিষাসুর বধ। তা আমরা বিবৃত করেছি চন্ডী-প্রসঙ্গে। এখানে বক্তব্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মহিষাসুর মোহের প্রতীক। এই মোহকে দুর্বার দৈবী শক্তিতে পরাভূত না করতে পারলে জীবনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এটিই উদাহৃত মহিষাসুর বধে।

মার্কন্ডেয় চন্ডীর মতো 'দেবী ভাগবতে'ও বলা হয়েছে মধু-কৈটভ বধে দেবীর প্রথম চরিত্র, মহিষাসুর বধে দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিত্র। দেবীর তৃতীয় চরিত্র প্রকটিত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে। এটিকে উত্তম চরিত্রও বলা যায়। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে দেবীর দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মধ্যে এসেছে তাদের অনুচর চন্ড আর মুন্ড, এসেছে ধূম্রলোচন। দেবী এদের সকলকে করেছেন নিধন। তারপর তিনি বধ করেছেন শুম্ভ-নিশুম্ভকে। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি বধের তাৎপর্য কী? অহঙ্কার আর বিষয়সুখ যথাক্রমে শুম্ভ ও নিশুম্ভ; ধূম্রলোচন নিঃসন্দেহে আলস্য; চন্ড-মুন্ড রাগ-দ্বেষ আর রক্তবীজ বাসনা। এসব প্রবল শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে তবেই জীবনীশক্তির সাধনা সফল হয়। 'সাধন-সমর' গ্রন্থে দেবী ভাগবতের এমন ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।

'দেবী ভাগবত' অনুসারে দেবী সচ্চিদানন্দময়ী। মধু-কৈটভ বধে তাঁর সত্তা অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রমানিত। মহিষাসুর বধে দেবীর চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানময়তা নিরূপিত। আর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে প্রতিষ্ঠিত দেবীর আনন্দময়তা।

মূল প্রকৃতি থেকে মণিদ্বীপ পর্যন্ত দেবী ভগবতীকে কোথায় কিরূপে আরাধনা করতে হয় তা 'দেবী ভাগবতে' সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। নবম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকে দেবীর পাঁচটি রূপ শেষ পর্যন্ত নির্নীত হয়েছে–

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধাস্মৃতা॥

অর্থাৎ সৃষ্টিবিধানে গণেশজননী (দেবী) দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পাঁচটি প্রকৃতিতে স্মরণীয়া।

দশম থেকে ত্রয়োদশ স্কন্ধে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেবী ভাগবতে দেবীর এই পাঁচটি রূপেরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে দেখি, দেবী সর্বশক্তিরূপা দুর্গা, সর্বসম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, সর্ববিদ্যাধীশ্বরী সরস্বতী, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সাবিত্রী আর পরমানন্দস্বরূপিণী রাধা। এসব রূপের সূত্রেই মনে করতে পারি 'দেবী ভাগবতে' দেবীর রূপচিন্তায় শক্তিসাধনার সঙ্গে লৌকিক চিন্তা, সাত্ত্বিক ভাব ও শৈশবতাকে অঙ্গীকার করা হয়েছে।

মায়ের আসন

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

মনুষ্যজন্ম হয় যে ধন্য মায়ের সেবায় জীবন সঁপে,
মায়ের মতো সাক্ষাৎ দেবী যায় না পাওয়া জপে তপে।
মাতৃরূপে আছেন কালী, মা দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারী
মা সরস্বতী, শ্রীমা লক্ষ্মী জ্ঞান ধন বিতরণকারী।
'মা'কে পূজে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎ মাঝে হলেন ধন্য
মায়ের সেবায় বিদ্যাসাগর সর্বজনের অগ্রগণ্য।
মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে মায়ের সেবায় জীবন ধারণ
মায়ের সেবাই সব চাইতে বড় সকল সেবার কারণ।
বিশ্বমাঝে অনেক মা এলেন গেলেন মায়ের বেশে
চারজন মা এলেন শুধু সেবা দিতে নিত্য হেসে।
মা সারদা এলেন ভবে শ্রী রামকৃষ্ণের পত্নী-রূপে
পুত্র-কন্যা জঠরে না ধরেই, মাতৃ-আসন তার স্বরূপে।
শ্রী অরবিন্দের 'শ্রী মা' সর্বজনের মাতা হলেন
দুই হাতে সেবা দিয়ে ছেলে মেয়ের বিলিয়ে গেলেন।
মায়ের আসন হয় না শূন্য, করেন পূর্ণ দিব্য বিভায়;
'মা আনন্দময়ী' মায়ের আসন প্রতিষ্ঠিলেন শুদ্ধ সেবায়।
সেবা দিলেন, আদর দিলেন, আরো দিলেন মিষ্টি হাসি
সারা ভারত মুগ্ধ হল, ধন্য হল কাশীবাসী।
কোলকাতায় মা টেরেসা পেলেন মায়ের কেমন আসন
দীন দুঃখী, কুষ্টরোগী বিশ্বজনের সেবার কারণ।
এঁরা সবাই মায়ের আসন লাভ করেছেন স্বর্ণ-বিভায়
এঁদের স্মরণ নিত্য হবে মন্দিরে আর কর্ম-গাথায়।
গর্ভধারিণী মাতা এঁরা নয়তো তবু যায় না কিছু,
'মায়ের মূর্তি' সেবা ও কর্মে সদাই চলে পিছু পিছু।
এঁদের কথা নিত্য হবে কর্মে-ধর্মে কথকথায়;
'মা' যে 'সত্য', 'মা' যে 'নিত্য', হাসি-কান্না, সুস্থ ব্যাথায়।

মাকে মনে পরে

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজে

২৫শে আগষ্ট সূর্য উঠেছে পুবের আকাশ রাঙিয়ে। আমার মন রাঙ্গিয়ে রয়েছে শ্রীশ্রীমারই রঙে। একটু বেলা বাড়তেই আশ্রম আঙ্গিনায় এলাম। স্বামিজী ও পানুদার সাথে দেখা করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সামনের বারান্দায় বসে তাঁরই কথা ভাবতে লাগলাম। কি মিষ্টি যে ভাবনা। কিন্তু তারই মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠে কি যেন একটা বিষাদের সুর। ক্ষণে ক্ষণেই মনে হয়–বিদায় গোধুলি যেন ধূলায় ছিন্নদল ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আজ আমার 'তে-রাত্রি' থাকার সময় আছে, কিন্তু শ্রীশ্রীমার আর সময় নেই। শ্রীশ্রীমার অনুমোদন সাপেক্ষ লখ্নৌ ফেরার ভাবনা ত্যাগ করে অমলদাকে পাঠালাম দেরাদুন স্টেশনে আমাদের ২৮শে আগষ্ট লখ্নৌ ফেরার টিকিট করতে। আমি ও অরুণদা বসে রইলাম শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সামনের বারান্দায়। শ্রীশ্রীমা ঘরে। আমরা বাইরে আমার সমস্ত মন-প্রাণ কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সাথেই একাকার হয়ে রয়েছে।

বিল্বজী আমাকে ও অরুণদাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। আজ ঘরের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের খাটখানা পূর্ব-পশ্চিম করে রাখা। শ্রীশ্রীমা তাতেই শান্ত সমাহিত হয়ে, নিথর, নিস্কম্প, নিস্তব্ধ হয়ে আছেন। মুখখানি সৌম্যতা প্রশান্ততার প্রতিমূর্তি। চোখ দুটো আমাদের চোখে। প্রণাম করলাম। মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রলাম। আসনে উপবেশন করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের স্পর্শীকৃত ফল আমাদের হাতে দেওয়া হলো। কিয়ৎকাল বসে থেকে শ্রীশ্রীমায়ের পরিচর্যার অসুবিধার কারণ হতে পারি ভেবে উঠে দাঁড়ালাম। শ্রীশ্রীমায়ের চোখ দুটো ছলছল জলভরা। ক্রমে নেমে এলো চোখের কোণে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুধারা। আমার মনের বাঁধন আগেই ভেঙ্গেছিল। এবার হৃদয় ভরে কান্না এলো। চোখে জলে ভরে গেলো। তবু নিজেকে সম্বরণ করলাম। আজ যে কান্নার দিন নয়। অনেক ভেবেছি, অনেক কেঁদেছি। অনেক বিদায়ের মধ্যে আজ শেষ বিদায়ের দিন। অনেক প্রণামের মধ্যে এখন শেষ প্রণামের ক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের কোণে বারবার এ কথাগুলোই ভীড় করে আসতে লাগলো। মনে হতে লাগলো যদি কোনো দিন শ্রীশ্রীমাকে শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণ করতে বসি বা লিখতে বসি তবে এই হবে মোর শেষ প্রণামের শেষ শুভক্ষণ। শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকারা শ্রীশ্রীমার অশ্রুবিন্দু মুছিয়ে দিলেন. আরো একটু পরে নয়ন ভরা জল নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে মুখ রেখে, শ্রীশ্রীমায়ের চোখে চোখ রেখে ঘরের বাইরে এলাম। যদি কেহ শুধায় আমারে কি কারণ, কেন ঐ সময় আমার মনে এই কথাগুলো মনে এসেছিল, কেন শেষ প্রণামের স্মৃতিচারণের কথা সেদিন সেইক্ষণেই ভাবছিলাম, উত্তর জানা নেই। তবু ভেবেছিলাম এইটুকুই শুধু জানি। আর জানি বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুর নাগাল পাওয়া যায়না।

দুপুরে আশ্রমেই প্রসাদ নিলাম। শ্রীশ্রীমা অসুস্থ তবু প্রসাদের উপকরণ অনেক। বোম্বে থেকে ডাঃ শেঠ শ্রীশ্রীমাকে দেখতে এসেছেন। সস্ত্রীক তিনি এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘের সভাপতি বি০কে০ শাহ ও লীলা বহিনও আমাদের সাথেই প্রসাদ নিলেন। অমলদা আমাদের ২৮শে আগষ্ট লখ্নৌ যাবার টিকিট করে এনেছেন। আমরাও ইতিমধ্যে স্থির করেই ফেলেছি আগামী কালই সকালে হরিদ্বার ফিরে যাবো। দু-তিন দিন সেখানে কাটিয়ে লখ্নৌ চলে যাবো। আমার মনের ভাবটা শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার মধ্যে আশ্রমিকদের

আর বিব্রত না করা। সর্বোপরি যে কাজটি বিগত বেশ কয়েক বছরেও রূপায়িত করতে পারলাম না, তা আজ এ অবস্থায় রূপায়িত হলেও রূপায়িত হতে পারে, কিন্তু আজ আর তার কোনো মূল্যায়ন বা সার্থকতা নেই। মনে হলো যা অপূর্ণ রলো তা অপূর্ণই থাক। এই অপূর্ণতাই যেন একদিন আমার জীবনে শ্রীশ্রীমাতৃ প্রসাদে পরম পরিপূর্ণতা এনে দেয়।

অমলদা ও অরুণদা বিকালে একবার দেরাদুন শহরে গেলেন। আমি একলা ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবনায় রপ্ত আছি। স্মৃতির পাতায় জাল বুনি। চোখের সামনে ভেসে উঠে অত্যুজ্জ্বল একটা ছবি। বাংলার অখ্যাত নদীমাতৃক পল্লীতে যাঁর যাত্রা শুরু, তিনিই আজ নগাধিরাজ হিমালয়ের কোলে মহাপ্রস্থানের আসন পেতেছেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই আমরা একবার আশ্রমে গেলাম। স্বামিজী ও পানুদাকে আমাদের অভিপ্রায়ের কথা জানালাম। জানালাম কাল সকালেই আমরা হরিদ্বার চলে যাচ্ছি। স্বামিজী ও পানুদা বারবার থাকার কথা বললেন। স্বামিজী বললেন–এখানে থাকলে তো অন্ততঃ দিনে একবার মাতৃ–দর্শন হচ্ছে। তাছাড়া তোমরা থাকায় মায়ের খেয়ালটা মাঝে মাঝে এদিকে থাকছে। কিন্তু মা যাদের রাখবেন না, তারা থাকবে কি করে? তাই আমরা চলে আসার কথাতেই স্থির রইলাম। রাতের প্রসাদ নিয়ে আবাসস্থলে ফিরে আসার প্রাক্‌কালে শ্রীশ্রীমায়ের আহ্বানে শেষ দর্শনের জন্য শেষবারের মতো পানুদা ও উদাসজীর সাথে মাতৃসমীপে উপনীত হলাম। ঘরের মৃদু আলোটা পরিণত হলো উজজ্বল আলোতে। প্রণাম করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছাকাছি মুখ রাখলাম। হাত দুটো বিছানার উপর। চেয়ে রইলাম মুখ পানে। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিও আমাদের দিকে নিবদ্ধ। ভক্তগণ আমাদের হাতে শ্রীশ্রীমাতৃ প্রসাদী কাপড় ও ফল প্রভৃতি দিলেন। আবার প্রণাম করলাম। আমার কাপড়টা শ্রীশ্রীমা দেখতে পাননি। তাই বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সমস্ত মুখটা ও হাত দুটো দোলায়িত হয়ে উঠলো। আধো–আধো টুকরো–টুকরো কথায় কাপড় কথাটার প্রথম চরণটা উচ্চারণ করলেন। ভক্তজন জানালেন–কাপড় দেওয়া হয়েছে। আমার হাতে সুন্দর কাপড়খানা শ্রীশ্রীমায়ের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। শ্রীশ্রীমা হাত দুটো অল্প একটু তুলে কাপড়টা স্পর্শ করলেন। তারপর শান্ত সমাহিত হয়ে শুয়ে রলেন। চেয়ে রলেন আমাদের দিকে। পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের কানের কাছে মুখ রেখে বললেন–"সুধীরভাই থাকবে বলে এসেছিল, কিন্তু মার শরীর অসুস্থ বলে চলে যাচ্ছে।" আমি একটু অপ্রস্তুতই বোধ করলাম। শ্রীশ্রীমা অপলক নেত্রে চেয়েই রলেন। পানুদা আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন–'আপনি মাকে কিছু বলুন।' কথাটা শুনামাত্র আমি যেন আরো অপ্রস্তুত হলাম। আরো ইতস্তত বোধ করতে লাগলাম। শ্রীশ্রীমাই তো আমাদের বলবেন, আমি শ্রীশ্রীমাকে কি বলবো? মুহূর্ত মাত্র চুপ থেকে শ্রীশ্রীমায়ের আরো কাছাকাছি মুখটা রেখে আমার অজান্তেই বলে ফেললাম–'মা তুমি সুস্থ হয়ে উঠো, আবার আসবো।' শ্রীশ্রীমা হাত জোড় করে অল্প একটু উর্দ্ধে তুলে স্নিগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে আমার দৃষ্টিকে উর্দ্ধপানে আকর্ষণ করলেন। তারপর আবার শান্ত সমাহিত ভাবে শুয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিলাম। এই আমার শ্রীশ্রীমাকে প্রথম ও শেষ তুমি বলে সম্বোধন।

শেষ বিদায়ের স্মৃতি নিয়ে 'যা চেয়েছি যা পেয়েছি তুলনা তার নেই,' একথা ভাবতে ভাবতে আবাসস্থলে ফিরে এলাম। একথা ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে উঠলাম। গাড়ি এলো। গাড়িতে মালপত্র উঠলো। আশ্রমের গেটের সামনে গিয়ে গাড়ি থামলো। পানুদা উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে নীচে নেমে এলেন। নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমায়ের গত রাতের শারীরিক অবস্থার কথা জানতে

চাইলাম। জানতে পারলাম রাতটা একটু ভালোই কেটেছে। পানুদাকে বললাম–শ্রীশ্রীমা সুস্থ হয়ে উঠুন এই আশা নিয়েই আমরা ফিরে যাচ্ছি। সামনের হলে শ্রীশ্রীমায়ের আসন ও প্রতিকৃতিতে প্রণাম করলাম। পানুদাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। গাড়িতে বসলাম। গাড়ি আশ্রম ছেড়ে দেরাদুন রেল-স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললো। মন পড়ে রলো ছোট্ট একটা ঘরে। চোখের সামনে ভেসে রলো সে ঘরের শয্যায় শায়িত শ্রীশ্রীমায়ের শান্ত সমাহিত মুখটি। আর নয়নে নয়ন রাখা তাঁর স্নিগ্ধ মধুর চোখ দুটো।

হরিদ্বার। আর্য সমাজ মন্দির। দুদিন এখানেই কাটালাম। অরুণদা এই প্রথম হরিদ্বার এসেছেন। এখানে সেখানে একটু ঘুরে বেড়ালেন। পরদিন সকালে কিছু সময়ের জন্য হৃষিকেশ ও লছমনঝুলায় গেলাম। আজ ২৮শে আগষ্ট লখ্‌নৌ ফেরার দিন। সকালবেলার সূর্যের কিছুটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে হরিদ্বারের পথে প্রান্তরে, গঙ্গার জলে আর দূর পাহাড়ের কোলে। আমি আপন মনেই বসে আছি আর্য সমাজ মন্দিরের গঙ্গার ঠিক তীরবর্তী উপরের ঘরে। দৃষ্টি দূর আকাশের দিকে আর সামনের চন্ডীপাহাড় ও নাম না-জানা হিমালয়ের ছোটো বড়ো গিরিশৃঙ্গের প্রতি। এমন সময় আকস্মিক ভাবে বারান্দার পাশের জানালায় কারো উপস্থিতি অনুভব করলাম। দৃষ্টি সেদিকে একটু ফেরালাম। চেয়ে দেখি আর্য সমাজ মন্দিরের ম্যানেজার। তাঁর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে একটু বিস্মিতই হলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মৃদু কন্ঠে জানালেন–মার মহাপ্রয়াণের খবর। হাতে একটা স্থানীয় সংবাদপত্র। কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত সত্তায় যেন একটা ধীর ও মৃদু আলোড়ন বয়ে যেতে লাগলো। এক মুহূর্ত পূর্বেও আমার সত্তায় যা ছিল, এক মুহূর্তেই তা নেই। শ্রীশ্রীমা নেই।

দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলাম। প্রথম পাতার মধ্যভাগে শ্রীশ্রীমার গতকাল রাত আটটায় মহাসমাধি লাভের সংক্ষিপ্ত একটু খবর। ম্যানেজারজী বললেন–আপনাদের সাথে শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমার একটা বিশেষ যোগাযোগের কথা জানা আছে বলেই সংবাদটা জানাতে এসেছি। পাশের ঘরে অবস্থানরত অমলদা ও অরুণদাকে ডাকলাম। সংবাদটা জানালাম। সকলের মনই বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। অমলদা ও অরুণদা পরবর্তী বিশদ সংবাদের জন্য ও প্রয়োজনে তখনই দেরাদুন যাবার ব্যবস্থা করার জন্য কনখল আশ্রমে চলে গেলেন। আমি একাকী বিজন ঘরে। আমার সমস্ত সত্তায়, মনে প্রাণে ভাবনায় ভাবনায় প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে–মা নেই, মা নেই। মা চলে গেছেন। এতোদিন যেমন করে পেতাম, আর তেমন করে পাবো না।

অমলদা ও অরুণদা কনখল আশ্রম হতে সংবাদ নিয়ে ফিরলেন। দেরাদুন যাবার প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীমার শ্রীদেহ কনখল আশ্রমেই নিয়ে আসা হচ্ছে। সেখানেই শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হবে।

বেলা এগারটায় মধ্যে আমরা কনখল আশ্রমে পৌঁছলাম। এতোদিনের পরিচিত আশ্রমটা যেন আজ অন্য সুরে বাঁধা। যেদিকে তাকাই শুধু মনে হয় সব আছে, শুধু মা নেই। এই আশ্রমে অনেক চরণচিহ্নের মধ্যেও তাঁর পায়ের চিহ্ন আর কোনোদিন পড়বে না।

অপরাহ্ণ প্রায় দুটোয় শ্রীশ্রীমার শ্রীদেহ শোভাযাত্রা সহকারে আশ্রম দ্বারে এসে পৌঁছল। হলের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব প্রথম অন্নপূর্ণাপূজা হয়েছিল এবং বর্তমানে শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে সেখানেই শ্রীশ্রীমার পাঞ্চভৌতিক দেহ সংস্থাপিত হল। সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন, পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করতে লাগলেন। আমরা বিনম্র চিত্তে প্রণতি জানিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তের নাতিদূরে বসে রলাম। স্মৃতি শুধু পড়ে আছে ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এমনি করেই কাটলো। তারপর ফিরে এলাম আবাসস্থলে। স্মৃতির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েই সমস্ত রাতটা কেটে গেলো। পরদিন বেলা এগারটার সময় আবার গেলাম কনখল আশ্রমে। বিপুল জনতার ভীড়। প্রণতি জানিয়ে জনতার ভীড়েই মিশে রইলাম। প্রনতি জানাতে এলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। সময় হলো শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করার। ভক্তজনের আকুলতার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীশ্রীমাকে সমাধিস্থ করা হলো হলের বাইরে উত্তর প্রান্তে। জনস্রোত মিলিয়ে গেলো। প্রায় শূন্য প্রাঙ্গণে আরো একটু সময় কাটালাম। তারপর অশ্রুসিক্ত মৌন বেদনায় শেষ বারের মতো কনখল আশ্রম প্রাঙ্গন হতে বিদায় নিলাম। ব্রহ্মকুন্ডে স্নান করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি প্রণতি জানিয়ে গঙ্গাজলে প্রদীপযুক্ত রাশিরাশি পুষ্পভেলা ভাসালাম। অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। শ্রীশ্রীমার মহাসমাধি লাভের পর আমরা কেউ কিছু গ্রহণ করিনি। আজ একাদশী। তাই কিছুটা দুধ নিয়ে আমরা রাতের গাড়িতে লখ্নৌ অভিমুখে রওনা হলাম। গাড়ি চলছে। জানালার পাশে বসে আমিও আনমনা হয়ে স্মৃতির পাতায় ভেসে চলেছি বারবারই মনে হতে লাগলো–জীবন যাঁকে নির্মলা হতে আনন্দময়ীতে পরিণত করেছে, মরণ তাঁকেই আনন্দময়ী হতে বিশ্বজননীতে পরিণত করেছে।

॥স্বপ্নে আমার মনে হল॥

দিন চলে যায়। দিন আসে। আমরাও মরণ সাগরের পথে এগিয়ে চলি। প্রয়াস করি–'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান। বলতে পারি কিনা তার উত্তর মিলবে শেষ পাড়ানির খেয়ায়। চলার পথে পুণ্য তীর্থ বেনারসে রয়েছি। শ্রীশ্রীমা নেই। আশ্রমে যাইনি। ভোররাতে স্বপ্ন দেখেছি একটা দিব্য পরিবেশ শ্রীশ্রীমা সমাসীন। আমি সামনে বসা। শ্রীশ্রীমা বললেন–'তুমি আশ্রমে গেলে না? আমি তো রয়েছিই। সব আশ্রমে যেও'। স্বপ্ন মিলিয়ে গেলো। তারপর আরো অনেকটা পথ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি। আজ আর সে প্রয়াসের ত্রুটি নেই। যেখানেই যাই যদি জানি বা শুনি যেখানে শ্রীশ্রীমার আশ্রম রয়েছে, অতি অবশ্যই যাই। হউক তা ক্ষণিকের জন্য। কেউ চিনলো বা না চিনলো, জানলো বা নাই জানলো, সে ভাবনা আর ভাবিনা জানি–শ্রীশ্রীমা তো আছেনই।

ভব তাপ বিনাশিণ্যৈ আনন্দঘনমূর্তয়ে।
জ্ঞান ভক্তি প্রদায়িণ্যৈ মাতঃ স্তুভ্যং নমাম্যহম॥

॥ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ॥

মাতৃ-স্বরূপামৃত

—শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

কেন উপনিষদে জানা যায় যে ব্রহ্ম স্বশক্তি প্রভাবে যক্ষ রূপে দেবতাদের কাছে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে জানতে পারেন নি। দেবতাগণ যক্ষকে জানবার জন্য অগ্নি ও বায়ুকে প্রেরণ করলেন। অগ্নি যক্ষ দ্বারা স্থাপিত একটি তৃণকেও দগ্ধ করতে পারলেন না—বায়ুও তৃণটিকে উড়াতে সমর্থ হলেন না। ইন্দ্র যখন গেলেন তখন যক্ষ অন্তর্হিত হলেন। তখন আকাশে যক্ষ মূর্ত্তির জায়গায় বহু শোভমানা এক নারীমূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি উমা হৈমবতী। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই যক্ষ মূর্তি কে?" উমা হৈমবতী বললেন, "সা ব্রহ্মেতি হোবাচ।" (কেন. ৪.১)। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম।' উমার রূপ সেখানে জ্যোতির্ময়ী, তিনি ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মের যা কিছু গৌরব সবই ব্রহ্মশক্তির স্বক্রিয়ায়। উমাই মা, উমাই জননী, উমাই নারায়ণী। মা শব্দের অর্থ বলতে দীপ্তিও বুঝায়। গমনার্থক অ ধাতুতে ডু (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাই আকাশে ইন্দ্র উমার যে সাক্ষাৎ পান সেই উমা গতিশীল আলোক-ব্রহ্মবিদ্যা। উমাই মা, কারণ তিনি সর্ব ক্লেশ হারিণী। উমা স্বরূপিণী মাকে ইন্দ্র এবং ঋক্‌বেদের ঋষিরা 'এক ঝলক বিদ্যুতের মত আভাসে দেখেছিলেন। প্রকৃতি প্রভাবে ব্রহ্মের যে অংশ জ্ঞেয় তাই হল ক্ষর, আর যার বিকৃতি নেই তা হল অক্ষর বা অজ্ঞেয় অংশ। ক্ষর, অক্ষর উভয়ের নিয়ন্তাই হঁলেন ব্রহ্ম বা ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, তাই মাতৃরূপে তিনি ব্যক্ত হতে বাধা নেই। ব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ ব্যক্ত হয় না, কারণ মন ব্রহ্মসত্তাকে ধারণ করতে পারে না।

মা সীমায় আসেন ব্রহ্মময়ী হয়ে—মা ও ব্রহ্ম একাত্মক। নারায়ণী ভাবে ভক্তের ভাব কল্পনায় তিনি এসেছেন। মায়ের মধ্যে সলিল, অপ এবং জ্যোতির সংযোগ বহুবার ব্যক্ত হয়েছে, মাতৃভক্তের দৃষ্টিপথে। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন—সূর্যের রূপ সর্ব্বদেবাত্মক। "সর্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ" (স্কন্দ। পুরাণ, কাশী, ৪৯।৩৫) অর্থাৎ সর্বদেবাত্মক তেজপূর্ণ সূর্য কিরণ দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন। সূর্যাগ্নির পরম বরণীয় জ্যোতিরশ্মি মায়ের দেহ থেকে একবার প্রকাশিত হয়েছিল একজন ফরাসী মহিলার ভাবদৃষ্টিতে। মহিলার নাম ছিল পেন্টরোজ। তিনি হরিরামজীকে বলেছিলেন, "আমি যখন আলমোড়াতে মার সমাধি অবস্থায় মার কাছে বসিয়া ছিলাম, তখন দেখিতে ছিলাম মার শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম হয়ত আমার দেখিবার ভুল হইতেছে, এই ভাবিয়া চক্ষু খুলিয়াও দেখি সেই রূপ। কিছুকাল পরে মার শরীর হইতে একটা সূর্য কিরণের মত জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৬৬)। 'জ্যোতি'কেই ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়, কারণ গায়ত্রী মন্ত্রের 'ভর্গ' হল জ্যোতি। পেন্টরোজ ভাবদৃষ্টিতে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে মাকে প্রতক্ষ্য করেছেন, জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছেন—এ হল ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মশক্তি, তাই তিনি মায়ের অর্থাৎ পরমজ্যোতির্ময়ী শক্তির সংস্পর্শে এসে মাকে জেনেছিলেন 'পরা জ্ঞান' বলে। তিনি বলেছেন, "আমি মনে করি মাই 'পরাজ্ঞান' (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ১৬৭)। ভক্তের ভাবে জগত কল্যাণ মা সাধনার খেলার সময় তাঁর ভর্গরূপিণী আদিশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তিনি বলেছেন, "- - - ভাবটা জাগিত আমি একা। আত্মীয় স্বজন কাহারও সঙ্গে যে কোন আকর্ষণ নাই, কেউ নাই। এক বিরাট শূন্য এবং বিরাট জ্যোতি। আবার একমাত্র জ্যোতিই, আর কিছুই নাই। আবার আমিও ঐ একই জ্যোতি।" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ১৪)।

শিবপুরাণ বলেছেন যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে "তদ ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যপ্তিরূপঞ্চ সন্ততম্" (শিব পু. জ্ঞান সংহিতা, ১০২৫) অর্থাৎ তখন দিব্য ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি বর্তমান ছিল। সেই ব্রহ্মের সনাতনী ইচ্ছা বা খেয়াল প্রকাশ পায় এবং এই ইচ্ছাই প্রথমে প্রকৃতি ও মূলকারণ বলে অভিহিত হয়। প্রকৃতিই হচ্ছেন মহাদেবী। তারপর পুরুষ ব্যক্ত হলেন। উভয়ে মিলে তখন সৃষ্টির চিন্তা করলেন, তখন আকাশ থেকে দৈববাণী হল, 'তোমরা তপস্যা কর'। তাঁরা তপস্যা করতে লাগলেন। উভয়ের অঙ্গ থেকে জলধারা নির্গত হতে থাকে, জলরাশি দ্বারা সবকিছু তখন ব্যাপ্ত হল। সেই জলরাশিকে শিবপুরাণ বলেছেন, "ব্রহ্মরূপম ভূজ্জলম্" অর্থাৎ "সেই জলরাশি ব্রহ্মস্বরূপ অনন্ত"। এই পুরুষ ও প্রকৃতিকে শিবপুরাণ বলেছেন, 'নারায়ণেতি বৈ নাম জাতংতস্য মহাত্মনঃ। নারায়ণীতিবৈ নাম প্রকৃতেঃ সম্মতং মুনে' ॥ (শিব পৃ০ জ্ঞানসংহিতা ১।২৯) অর্থাৎ 'এই জন্য সেই পুরুষের নাম নারায়ণ এবং প্রকৃতির নাম নারায়ণী হল।' এই শিবপুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, নারায়ণী নারায়ণের সঙ্গে জলে শয়ন করেন।

ভক্তগণের প্রতি মায়ের করুণার অন্ত ছিল না। তিনি সারগর্ভ এবং তাত্ত্বিকভাবে তাঁর নারায়ণী এবং স্বরূপের অতি গুহ্যতম কথা সরল ভাবে প্রকাশ করেন ভক্তগণের ইচ্ছায়। মার কিন্তু কোন দিন এমন কোন খেয়াল প্রকাশ পায় নি যে, তিনি ভক্তগণের সামনে উত্তমরূপে চিহ্নিত হবার জন্য লীলা ব্যক্ত করেছেন। ভক্তদের মনের ভাবই মায়ের লীলার কারণ, কথনও বা স্বরূপ প্রকাশ। একবার ১৩৫১ বাংলা সনে, ১২ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, মা বলছেন, "এই শরীরটা কি রকম দেখছি জান? যেন মাখন দিয়া গড়া আর তাতে উজ্জ্বল শুভ্র ঘন জ্যোতি। বললেও বলা হয় না। আর সেখানে বটপত্রে শিশুরূপী ভগবান আপন পা আপনি চুষছেন। ঠিক সেই রকম মূর্তি। তবে শোয়া অবস্থায় না– বসা। নধর নধর শরীর। বসে বসেই ঐ ভাবে পাটা চুষছেন। পূর্ণরূপ–রংটিতে যেন কি রকম একটা গভীর নীল জ্যোতি–অপূর্ব কান্তি। তবু কিন্তু বলা হল না। পাশেই একটি অতি সুন্দর ছোট্ট শিশু মেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। তার শুভ্র জ্যোতিতেও যেন সব আলো করে আছে" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৬৬-৬৭)। শিবপুরাণ বর্ণিত নারায়ণী এবং নারায়ণ দিব্য ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁরা জ্যোতির্ময়ী এবং জ্যোতির্ময়। অভয় মার সামনে ছিলেন এবং তিনি বলে উঠেছিলেন "পুরুষ প্রকৃতি"। মা অভয়ের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। অভয় ব্রহ্মময়ী মাকে আবার প্রশ্ন করলেন–"মা, আপনার ভিতর থেকেই এই সব বের হয়েছে তো?" মা মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন। গুরুপ্রিয়া দিদি বললেন, "মা, তোমার শরীরের ভিতর থেকেই বের হল এসব তাহাও দেখেছ-তে?" মা বললেন–"বাহির আবার কি হবে? আছেই ত সব" (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, অষ্টম ভাগ, পৃঃ ১৬৭)

শিবপুরাণ বর্ণিত ছোট্ট নারায়ণী কিন্তু প্রথম জাতা, তিনি শুয়ে আছেন জ্যোতির জ্যোতি হয়ে, মা ও তাই ব্যক্ত করলেন গুরুপ্রিয়া দিদিদের কাছে। মা যে 'বাচ্চি' বলতেন নিজেকে, ভক্তের ভাবের তন্ত্রে সেই তো মার নারায়ণী রূপ। মায়ের বর্ণনায় জানা যায় এখানে যে, নারায়ণ রূপ শিশুটি বসা, শুয়ে নেই। পূর্বেই বলেছি, অসীমতার নাম অদিতি, অদিতি অনন্ত প্রকৃতি। তিনিই সূর্যাগ্নির তেজরাশি, প্রতিটি রশ্মিই তো দেবতা, তাই তিনি মা, তিনিই নারায়ণী, জলগণের অখন্ডরূপ, জল মানে এখানে আকাশেরই সূর্যরশ্মি–সূর্যজ্যোতি। তিনি নারস্য অর্থাৎ আকাশ সলিলের আশ্রয় স্বরূপ। শিবপুরাণ বলেছেন সে নারায়ণী প্রথম একা ছিলেন জ্যোতির্ময়ী হয়ে, নারায়ণ ব্রহ্মা এবং শিব তখনও ব্যক্ত হন নি।

সর্ব্বদেব তেজোময়ী উমাকে কেন উপনিষদে দেখা গেল 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' মা রূপে, নারায়ণী

রূপে। সত্যকথা বলতে গেলে বৈদিক দেবতাদের উৎস নারায়ণী রূপিণী অদিতি থেকে অর্থাৎ জ্যোতি থেকে–স্বর্গে দেবতারা থাকেন, স্বর্গ হলো জ্যোতি সমুদ্র বা অনন্ত আলোর অমৃতলোক। তাই তো সন্তান অফুরন্ত আলোতে যেতে চায়, জ্যোতির্ময়ী যে তার মা। বলা হয়ে থাকে 'ওঁ মা' থেকে 'উমা' শব্দটির প্রকাশ। প্রণব রূপেও উমা শব্দটির আলোচনা হয়ে থাকে। উমা আবার হৈমবতী, তাঁর কান্তি হেমবৎ, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত বলে তিনি হৈমবতী। উপনিষদের উমার স্বরূপ বৈদিক সোমে প্রকাশিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সোম আসলে ব্রহ্মজ্ঞান–এই অভিমত প্রদান করেছেন স্বয়ং সায়নাচার্য। শতপথ ব্রাহ্মণে ১১.১.৫.৩. মন্ত্রে সরল ভাবে বলা হয়েছে, "চন্দ্রমা বৈ সোমঃ" অর্থাৎ সোমই চন্দ্র। ঋকবেদে সোমকে বলা হয়েছে সবিতা ও অগ্নি (ঋ.বে.৯.৬৮.২৬)। সূর্যাগ্নিরূপী সে রশ্মি চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকে ভরিয়ে দেয়, তাঁকেই বলা হয় চন্দ্র, তাঁকেই সোম বলা হয়। চন্দ্র আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বা শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম। ঋকবেদের খিলমন্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে 'চন্দ্র' (ঋ.খিল, ২।৬।১)। চন্দ্রই শ্রীসূক্তের দেবী শ্রী। কাঠক সংহিতায় প্রকাশিত হয়েছে 'সোম অম্বা' (কাঃ. সংহিতা ৫।৪) অর্থাৎ সোম মা। ঋকবেদ বলেছেন সোমই গৌরী (ঋ.বে.৯.১২.৩)। সায়ন ভাষ্য গৌরী হলেন বাক্–"গৌরী গান্ধর্বী ইতি বাঙনামসু পাঠাৎ"। ব্রহ্মময়ী অম্ভৃণী বাক্ বলেছেন, "অহং সোমমাহনসং বিভর্মি (ঋ. বে. ১০.১২৫.২) অর্থাৎ 'আমি সোমকে ধারণ করি'। তাই সোমই চন্দ্র, চন্দ্রই বাক্, বাক্ই গৌরী তথা জ্যোতির্ময়ী নারায়ণী, এবারকার লীলায় মা। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণী অরূপ হয়েও জ্যোতি রূপা উমা হয়ে প্রকাশিতা হন। সন্তানের ভাবনায় মায়ের ভাবদেহ থেকে জ্যোতির ছটা প্রকাশিত হত, তাই জ্যোতির্ময়ী নারায়ণীর জ্যোতিরূপ কখনও কখনও ভক্ত সন্তান দর্শন করতে পারত। এ সম্পর্কে মা বলেছেন "কখনো কখনো আমার শরীর হতে এমন জ্যোতির ছটা বাহির হত, তাতে চারদিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। সেই জ্যোতি ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এমন মনে হত।" (মাতৃদর্শন, পৃঃ৫৩)।

পার্ব্বতী হেমকান্তীময়ী হিমবতের দুহিতা। শতপথ ব্রাহ্মণে তিনি পার্ব্বতী স্বরূপ (শতঃ পঃ ব্রাঃ ১।৫।১৫)। পার্ব্বতী মাতৃশক্তি, মাতা। শংকর কৃত অন্নপূর্ণা স্তবে "মাতা চ পার্ব্বতী" অর্থাৎ পার্ব্বতী মাতা। পার্ব্বতী মহাশক্তি। তন্ত্রে শিব পার্ব্বতীকে বলেছেন, "যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রা প্রকীর্তিতাঃ। তে সর্ব্বে তব মন্ত্রা সুস্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ" (মহা. নি. ত.৫.১৯) অর্থাৎ 'যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র বর্ণিত হয়েছে সে সব তোমারই মন্ত্র, কেন না তুমিই আদ্যা প্রকৃতি'। ললিতা সহস্রনামে পার্বতীকে বলা হয়েছে "সর্বেশ্বরী সর্বময়ী সর্বমন্ত্রস্বরূপিনী" (ললিতা. স. ১০৩) অর্থাৎ তিনি সর্বমন্ত্রস্বরূপিনী। দুর্গা সপ্তশতীতে পার্ব্বতী মহাদেবী। দেবতারা শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণের জন্য হিমালয়ে দেবীর স্তব করেছিলেন। পার্ব্বতী তাঁদের প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কার স্তব করছেন?' সেই সময় পার্ব্বতীর শরীর কোষ থেকে শিবা অম্বিকা প্রকাশিতা হয়ে উত্তর দিলেন যে দেবতারা তাঁরই স্তব করছেন। অম্বিকাই কৌশিকী। কৌশিকী পার্ব্বতীর দেহ থেকে নির্গতা হবার পর তিনি কৃষ্ণা হলেন–হিমালয়ে অধিষ্ঠিতা হয়ে কালী নামে আত্মপ্রকাশ করলেন (দুর্গা সপ্তশতী. ৪.৪১)। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে হিমালয় দুহিতা উমাও কালী নামে খ্যাত হয়েছেন। উমা শৈলসুতা, তিনিই পার্ব্বতী, গিরিজা–তিনি কৈলাসবাসিনী বা মন্দরবাসিনী বা বিন্ধ্যবাসিনী।

পার্ব্বতী উমা সিংহবাহনা, শক্তি-দেবীর প্রাচীন রূপই হল পার্ব্বতী উমা। তবে এই প্রসঙ্গে অথর্ব বেদের খানিকটা উল্লেখ নিই, তবে স্পষ্ট ভাবে 'দেবী'র স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ব্রহ্মান্ডাত্মক স্বরূপ লক্ষণে নারায়ণীর তথা পার্ব্বতী উমার কথা অথর্ব বেদে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন 'সিংহে ব্যাঘ্রে উত যা পৃদাকৌ

তিষিরগ্নৌ ব্রাহ্মণে সূর্যে যা। ইন্দ্রং যা দেবী সুভজা জান সা নঐতু বর্চসা সংবিদানা॥ যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে ত্বিষিরপ্সু গোষু যা পুরুষেষু – – – রথে অক্ষেবৃষভস্য বাজে বাতে পর্জন্যে বরুণস্য শুষ্মে- – – রাজন্যে দুন্দভাবায়তাষামশ্বস্য বাজে পুরুষস্য মায়ৌ। ইন্দ্রং যা দেবী – – –” (অথর্ব. বে. ৬.৪.৪.১–৪) অর্থাৎ 'দীপ্তি রূপে যিনি সিংহে, ব্যাঘ্রে, সর্পে, অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, সূর্যে আছেন ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যে সুভগা দেবী- –সেই তেজোদীপ্তা দেবী আমাদের কাছে আসুন। যিনি দীপ্তি হস্তীতে, দীপ্তিতে ও স্বর্ণে, দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গো সমূহে, পুরুষ সমূহে, – – – দীপ্তি রূপে যিনি রথে ও তার চাকাগুলিতে, বৃষের গতিতে, বায়ুতে, পর্জন্যে–বরুণের শক্তিতে – – – যিনি দীপ্তিরূপে রাজন্য, দুন্দুভিতে, অশ্বের গতিতে, পুরুষের উচ্চশব্দে সেই তেজোদীপ্তা সুভগা দেবী, ইন্দ্রকে জন্ম দিয়েছেন যিনি, আমাদের কাছে আসুন। এই ইন্দ্র জননী অদিতি, তিনিই জ্যোতির্ময়ী নারায়ণী। তিনিই বৈদিক দেবতা প্রধান বা দেববাদ প্রতিষ্ঠাত্রী প্রথম জ্যোতিঃ 'মাতা দেবানাম্'। তিনি অরূপা, ভক্তকে অনুগ্রহ করতে তিনি জ্যোতিরূপে এলেন, কেন উপনিষদের উমা হয়ে, ঋষি দুহিতা বাক হয়ে, বিংশ শতাব্দীতে মা হয়ে আবির্ভুতা হলেন।

পূর্ণব্রহ্মময়ী মা ভক্তের ভাবনায় অধরা হয়েও যেন পার্ব্বতী রূপে শ্রী নরেন চৌধুরীকে আপনা আপনি স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। ভাবদৃষ্টিতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চৌধুরী মহাশয় মাকে দর্শন করলেন। তিনি লিখেছেন 'আমি কিন্তু চমৎকৃত হয়ে দেখলাম-হিমালয়ের পাদদেশে স্থিরভাবে দন্ডায়মানা, শুক্লাম্বরা, পরমাসুন্দরী, দ্বিভূজা দীপ্তিময়ী পার্ব্বতী মূর্তি। তাঁর এই পার্ব্বতী রূপে মাতৃদর্শন লীলায় মা খন্ডরূপে ভাবের সীমায় এলেন, শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে পার্ব্বতী ভাবে মাকে রূপময়ী বলে দর্শন করা অকল্পনীয় নয়। এসব খন্ডরূপে মাতৃদর্শন করলেও ফল হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে মা খন্ড রূপেও থাকেন, তবে তাতে তিনি রেখায়িত হয়ে থাকেন। ভাবঘোরে আবেগমথিত চিত্তে যখন রূপময়মূর্তিতে সীমার মধ্যে আসেন ব্রহ্মময়ী মা, আর তাঁর শ্রীচরণে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন–তখন কি মা ধরা দেন? মা পূর্ণ, রূপে এলেও পূর্ণ–মা ভক্তের ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হলেও তাঁকে জানা যায় নি–জানা যায় না। কারণ পূর্ণকে জানা যায় না। অথচ সন্তানের প্রতি অসীম করুণায়, সাধারণভাবে ভক্তের চাওয়ায় তাত্ত্বিক ভাবে তিনি তাঁর নারায়ণী স্বরূপে গুহ্যতম কথা আপন খেয়ালে প্রকাশ করেছেন অবশ্য যেমন ভক্ত তার তেমন ভাব–প্রকাশটা ভক্তের ভাবানুসারী হয়েছে সব সময়। মার কথায় তাঁকে যেমন ভাবে বাজানো গেছে তিনি তেমন ভাবেই বেজেছেন।

(ক্রমশঃ)

আনন্দময়ী স্মৃতি

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ভক্তদের আগ্রহে আমার মার বিষয়ে লেখা। প্রথমে আমি ইতস্ততঃ করেছিলাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হল—এতো আমারই সৌভাগ্য মার কথামৃত আলোচনায় আমার আত্মশুদ্ধি তো হবেই—আমার বন্ধ ঘড়িতে দম দেওয়া হবে। মা বলতেন—"সৎসঙ্গে যোগ দেওয়া মানে ঘড়িতে দম দেওয়া চাবি দেওয়া।" গয়ার গ্রীষ্মে ফল্গুনদীর লুপ্ত ধারা যেমন বালির তলায় তির তির করে চিরতরে বয়ে যায়, বাইরে তার প্রকাশ অবলুপ্ত হলেও; তেমনি মায়ের জন্য চাপা কান্না আমার ভেতরে সব সময় আছেই। বাইরে হাসি গল্প সবের মধ্যেই আছি ঠিকই, কিন্তু মা যাবার পর থেকে অশ্রু ধারা একেক সময় বুক ভেঙ্গে রুদ্ধদ্বারে একা ঘরে বেড়িয়ে আসে।

'আজ ঐ শুভ্রকোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে।'

আজ স্বপ্ন মনে হয় তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবনের ২৭টী বছর কেটে গেছিল, তার থেকে ছিঁটে ফোঁটা কয়েকটি ঘটনা স্মৃতি রোমন্থন করে আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করব।

'পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।'

জাগতিক দিক দিয়ে মার দেখা প্রথম পাই ১৯৫২ সালে। কিন্তু মা পূর্বে বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ বহু আগেই আমার ঘটেছিল। "তোমাকে ৯ বছর যখন তোমার বয়স তখন দেখা। বাঁ দিকে সিথি করতে, ফোলা হাত ফ্রক পরা"। ২রা বৈশাখ, ১৯৫২ সালে ডাঃ গোপাল দাশগুপ্তর বাড়ীতে মার প্রথম দর্শন। অপলক নেত্রে তাঁকে প্রথম দর্শন করলাম। মুখ দিয়ে ৬টী ইংরাজী শব্দ বেরোল। 'She is not of this world' তিনি জগতাতীত।

কুন্তলকৌমুদীযুক্তা শুদ্ধাসনাতনী হৃদয়বাসিনী মাকে দেখলাম। গোপালদা ১০৮ লাল পদ্মের মালা মাকে পরালেন। অভয়দা বসে গাইছেন—

"জনম জনম গাঁথলাম মালা
কার লাগি তা জানতাম না
জনম জনম সাজাই আলো
তোমার লাগি তা মানতাম না।
আজকে দেখি তোমার গলে
মালা আমার ঐ যে দোলে
তোমার বেদীর তলে ঐ যে
জ্বলে আমার সকল বাতি।"

ধীরে ধীরে এগোচ্ছি হাঁটু গেড়ে ভয়ে ভয়ে কোলের কাছে মাথা নামিয়ে ওঠাতেই মার প্রশ্ন—তোমার

নাম কি? বাবার নাম কি? কী পূজা করো ইত্যাদি। মা কে বললাম। দিদির রণরঙ্গিনী মূর্তিতে প্রবেশ ইতিমধ্যে। কিছু পরে দিদির প্রস্থান। মাকে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলি—আমি ২৯শে আগষ্টএ বছর (১৯৫২) পি.এচ.ডি. করতে আমেরিকা রওনা হব। হঠাৎ মার সেই ভুবন মোহিনী হাসি গোমুখী ধারার মত অজস্র উচ্ছল অনবদ্য। "এবছর তোর আমেরিকা যাওয়া হবে না"। মা বললেন। আমি স্তম্ভিত। অভিমান সুরে বললাম, 'কেন?' মার উত্তর—'তুমি এ শরীরের কাছে এক বছর কাটিয়ে তবে যাবে'। আমার scholarship ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া হল। যে ছেলেটি কাজ করছিল তার কাজের দেরী হল বলে সত্যি আমি next year গেলাম।

বিদেশে যাবার আগে কোলকাতায় একডালিয়া রোডের আশ্রমে মার সঙ্গে কয়েক বার দেখা হয়েছিল--মার সঙ্গে প্রাইভেটও হয়। মার চরণের খড়ম আব্দার করে রক্ষা কবচের মত চেয়ে নিই। এটি বিদেশে সব সময় আমার hand bag এ থাকতো। বিদেশে যাবার আগে মা হাত ধরে আমায় তিন সত্যি করিয়ে নেন, "যেমনটি যাবে ঠিক তেমনটি ফিরে আসবে"। বিয়ে না করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। বিদেশে মার পাঠানো দুটি চিঠির উল্লেখ করছি।

১৯৫৪ সালে লেখা—

"শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই তো পড়ে—নিজকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য সর্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। একলাটি? একলা কোথায়? বন্ধু কি আর বন্ধু ছেড়ে?"

১৯৫৫ সালে U.S.A. তে মার চিঠি পাই, "এমন একটা স্থিতি, যেখানে বেতারে যেমন সুর আসে, ভক্তের আকুলতা ব্যাকুলতা চাহিদা, অচাহিদা সবই খেলা করে। তিনিই প্রেরণা যোগান, ব্যাকুলতার, আবার তিনিই নিজে অপেক্ষা করে বসে থাকেন কখন ভক্তের উন্মুখতা হবে। ফাঁক পেলেই তিনি স্বয়ং ঢুকে যাবেন। আবার ফাঁক না পেলেও তিনি ফাঁক করে ঢুকে পড়েন। তিনি চাইলে উল্টো পাত্রও সোজা করে নিতে পারেন।"

মার চিঠি পেলাম ১৯৫৫তে, পানুদা লিখেছেন—"মা বললেন তুমি সম্ভব হলে একবার মার সঙ্গে দেখা কর।" ফিরলাম ১৯৫৫ জুন মাসে summer vacation এ। তখনো বুঝিনি এরপরে আমার আর Ph.d. complete করতে ফেরা হবে না।

ফিরে কোলকাতায় নেমেই সোলনে মা তখন ছিলেন, সেখানে ছুটলাম। মার কাছে যাবার পথে ট্রেনে গুণগুণ করে গাইলাম—

"তব দয়া দিয়ে হবে যে মোর জীবন ধুতে
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে।"

আবার মনে এল—

"করুণা-তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া
এনেছ তোমারি দুয়ারে॥"

সোলনে পৌঁছলাম। মা যোগীভাই সোলনের রাজার বাড়ীতে কীর্তন সভায় বসা। মাকে কাছে পেয়েও

তৎক্ষণাৎ কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনা। আস্তে আস্তে ঢুকে দূর থেকে ভূমিতে মাকে প্রণাম করলাম। যেই উঠে চোখ মেলেছি মার সেই প্রাণ মাতানো মনভুলানো হাসি এসে আলিঙ্গন করে নিল।

এরপরেই মার সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দুই মাস ঘুরেছিলাম। মার নিবিড় একান্ত সঙ্গ জীবনে প্রথম প্রাণ মনভরে পাই। এসময়ই decision নিলাম যে আর বিদেশে ফিরবোনা। এর পর কোলকাতায় ফিরে—মার চিঠির একটি বাণী "ভগবৎ কর্ম সাধনের জন্যই দেহখানি"—আমার বিদ্যার্থী career এর অবসান এনে দেবার শক্তি পাই। সব ছেড়ে ঝাঁপ দিলাম আশ্রম জীবনে। এর মধ্যে বহুবার private করি ও মার যে পূর্ণ স্বীকৃতি ও অনুমতি পাই তা বলা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

উৎসব–সূচী

১. শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা	--	৯ই--১২ই এপ্রিল
২. শ্রীশ্রী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস তিথি উৎসব	--	১৪ই এপ্রিল
৩. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মদিন	--	৩রা মে
৪. অক্ষয় তৃতীয়া	--	৪ঠা মে
৫. বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি	--	৯ই মে
৬. বুদ্ধ পূর্ণিমা	--	১৬ই মে
৭. শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি	--	১৮ই মে (রাত্রি ৩টা)
৮. গঙ্গা দশহরা	--	৯ই জুন
৯. গুরু পূর্ণিমা	--	১৩ই জুলাই

ভাইজীর দশম বাণী

—'জয়'

"তাহার নিকট ভেদাভেদ নাই; ভাবই তাঁহার আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্র। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।"

ভাইজীর প্রতিটি বাণী সাধকের গভীর অতলস্পর্শ ভাবসাগরের এক একটি প্রাণস্পর্শী গম্ভীর অভিব্যক্তি। প্রতিটি বাণীর সূক্ষ্ম ভাব তরঙ্গ আমাদের অভ্যস্ত বহির্মুখী ভাবনার মূলে আঘাত করে তাদের অন্তর্মুখী করে দেয়। সাধারণ ভাবে জগতের স্থূল বিষয় নিয়ে আমরা সদাই ব্যস্ত। একটু গভীর ভাবে ভিতরের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে এই স্থূল প্রকাশময় জগতের আড়ালে আছে অপ্রকাশ নীরব এক ভাব জগৎ, যা প্রকৃতভাবে রয়েছে এই প্রকাশময় বিশ্বের মূলে। শ্রীমা কত সুন্দর করে বলেছেন—'গঙ্গার উৎপত্তি স্থান লোকচক্ষুর অতীত গভীর অরণ্যে, অথচ তার স্নেহ ধারা কত দেশকে শস্যশ্যামলা করে তাদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করছে। ভাবই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল। কর্মজগৎ প্রকাশ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, আর ভাব জগতের খেলা নীরব ও অপ্রকাশ, আর তা না হলে ভাবের পুষ্টি হয় না এবং এই ভাবের পুষ্টি নিয়েই কর্মজগৎ চলে।'

সরব ও প্রকাশময় জগতের খেলা চলে স্থূল নিয়ে। নীরব ও অপ্রকাশ ভাবের লীলা চলে সূক্ষ্মে। আর মায়ের শ্রীমুখ থেকে শুনলাম—নীরব ও অপ্রকাশ অবস্থায়ই ভাবের সমধিক পুষ্টি হয়। ঋষিরা গভীর এই সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের রহস্য অনুভব করে বলেছিলেন—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ—তস্মাৎ পরাঙ্পশ্যতি ন অন্তরাত্মান্! কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। বিশ্বনাথের লীলার ইচ্ছায় জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বার সব বহির্মুখী করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে সবাই বাইরেটাই প্রথমে দেখে। আর তাই প্রাথমিক ভাবে বাইরের বিষয় নিয়েই সকলে সদা ব্যস্ত থাকে। অপ্রকাশ ভাবজগতের খবর ও তার আড়ালে প্রত্যক্ষ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে ও তাঁর লীলার খেয়ালকে তারা জানতে পারে না। যারা ধীর, যারা তাঁকে জানতে চান, যারা জানতে চান—কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? সৃষ্টি লীলার মধ্যে এখানে কি কর্ম দেবতা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন? তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে অন্তরাবৃত্ত হন। অন্তরাবৃত্ত না হলে ভাবরাজ্যের রহস্য আমাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। অজ্ঞানের অন্ধকারে কর্মবহুল বহির্জগতের গতিবিধি ও পরিণতি চিরকাল আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে যায়। সূক্ষ্মে যা 'ভাব', স্থূলে তাই 'কর্ম' রূপে প্রকাশ পায়। আবার কর্মরূপে যা প্রকাশিত হল তার অনুকূল বা প্রতিকূল সংবেদনাই যথাযথ ভাবে ভাব ও সংস্কারকে পুষ্ট করে। কর্ম থেকে ভাব ও সংস্কারের সৃষ্টি, আবার ভাব ও সংস্কার অনুযায়ী কর্ম। তাই ভাইজী বললেন—যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

শ্রীমা স্বয়ং মহাভাবময়ী। কোন বিশেষ ভাবকে অঙ্গীকার করে তিনি তাঁর অবাধ ভাবসাগরকে কূলের মধ্যে বদ্ধ করে লীলা করেন নি। তাই তাঁর দিক থেকে জগতের কারুর প্রতি, কিছুরই প্রতি ভেদদৃষ্টি বা ভেদভাব ছিলনা। আমাদের কাছে এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অভিজ্ঞতা, অথচ আমাদের চোখের সামনেই

নিত্য দিন শ্রীমায়ের কথায় ব্যবহারে কত সুন্দর ভাবে অপ্রাকৃত এই চরম সত্যটি ফুটে উঠত। একদিন একজন মাকে প্রশ্ন করছে যে-মা ভগবান জগতে ভালর সাথে মন্দও সৃষ্টি করলেন কেন? মা তখুনি তাকে বলছেন–"বাবা ভগবানতো কিছু সৃষ্টি করেননি, তিনিই ত এই সব হয়েছেন"। কি অদ্ভুত কথা। শ্রীচন্ডীতে দেখি মধু কৈটভ বধের আগে ব্রহ্মা আদ্যাশক্তিকে স্তব করে বলছেন–মা তুমি এক দিকে মহাদেবী, মহামেধা, মহাস্মৃতি আবার তুমিই মহাসুরি, মহামায়া, মহামোহ। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা মায়ের স্তব করে বলেছেন–সুকৃতিদের গৃহে তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীরূপে প্রকাশিতা। আবার পাপীদের গৃহে সেই তুমি অলক্ষ্মীরূপে প্রকাশিতা। তাই দেখছি মা ত কিছু করেন নি, মা ই সব হয়েছেন। মায়ের কথায়, "এ ত তাঁর নিজেকে নিয়ে নিজের খেলা, তাঁর লীলার মৌজ"। লীলাকে আনন্দময় করে রাখার জন্য সাধারণ ভাবে শ্রীমা তাঁর সর্বময় স্বরূপটি সকলের কাছে সদা প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। আবার কখনও না কখনও কোন না কোন ঘটনার মধ্যে দিয়ে কি সুন্দরভাবে তাঁর এই স্বরূপটি কোন কোন ভাগ্যবানের সামনে প্রকাশিত হত। কখনও গুরুপ্রিয়া দিদি মায়ের সেই সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত বিরাট স্বরূপের আভাস পেয়ে বলতেন–উঃ, কার সঙ্গে ব্যবহার করছি আমরা। মা ভুলিয়ে রাখেন তাই ব্যবহার করতে পারি। মনে পড়ে যায় ঢাকা রমনা আশ্রমে কালী মূর্তির গহনা চুরির কথা। তখন মা কক্স্‌বাজারে ছিলেন। ঐ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে মা বলেন–'সেই দিন সকাল বেলা হইতেই নিজের শরীরেই এক হাত দিয়া অপর হাতখানা ভাঙ্গিবার বা কাটিবার ভাব প্রকাশ হইতেছিল। খুকুনী ভয়ে ভয়ে দা, ছুরি ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিতেছিল এবং এই শরীরটাকে ছেলেমানুষের মত ভুলাইয়া রাখিতেছিল। কথাটা হইল এই যে চোরটার সকালবেলা হইতেই ঐ ভাবটা প্রবল হইতেছিল। অবশ্য সে চুরি করিল রাত্রিতে, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতেই চুরি করার ভাবটা প্রবলভাবে চলিতেছিল। চোরের ওই ভাবটিই এই শরীরের মধ্যে আসিয়া ঐ ভাবে প্রকাশ হইতেছিল। কারণ ঐ চোরই বা কে? ঐ চোরও যে আমিই। কে কার হাত ভাঙ্গিবে? আমিই যে আমার হাত ভাঙ্গিয়া গহনা নিয়াছি। এক ছাড়া দুই কোথায়?'

কি অদ্ভুত কথা, কি অদ্ভুত সংবাদ। লীলা ছলে মা-ই অনন্তরূপে জগতে লীলা করছেন। একদিকে তিনি 'সর্বজ্ঞ' সর্বশক্তিমান আবার অন্য দিকে নিজেরই মায়া শক্তি দিয়ে নিজের স্বরূপ ঢেকে তিনি রূপে রূপে জীব সেজে 'অজ্ঞ' ও সীমিত শক্তির অধিকারী হয়ে রয়েছেন। মায়ের এই নিজের মায়ার আবরণ উন্মোচনের খেলাই 'সাধকের সাধনা', আর তাঁর স্বরূপ স্মৃতিকে আবরণ দিয়ে ঢেকে খেলার খেয়ালই জীবের 'জগৎ ভোগে'র ইচ্ছা। মায়ের এ প্রসঙ্গে ঐ এক কথা–"এ তো তাঁর নিজেকে নিয়া নিজেরই খেলা, এখানে দুই কোথায়?" তবু তাঁর খেলার খেয়ালে জীব সে গুহ্য বিষয়ে অজ্ঞ। এখানে অনন্ত শরীরে, অনন্ত রূপে, অনন্ত ভাবে, অনন্ত ইচ্ছাপূর্তির খেলায় জীব নিযুক্ত। মূলের বোধটি তার বিস্মৃতির অতলে। তাই সে সদাই নিজেকে একক ও স্বতন্ত্র ভাবে। এখানে সকলের ভিন্ন বিদ্যা, সামর্থ্য ও সংস্কার অনুয়ায়ী সকলের ভাব অনন্ত, চাওয়াও অনন্ত–তাই প্রাপ্তিও অনন্ত অনুভবে ভিন্ন। ভাইজী বললেন–আমাদের এই ভাবের ভিন্নতাই শ্রীমায়ের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের সূত্র।

শ্রীমায়ের দিক থেকে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই নাই। তিনি সদাই রয়েছেন এক অবিচ্ছিন্ন, এক রস, নিরপেক্ষ আনন্দঘন স্বরূপে। এই স্বরূপ লাভই ছিল ভাইজীর জীবনের চরম লক্ষ্য। তিনি নিরলস ঐকান্তিকতার সঙ্গে সেই চরম লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন। একটা সময় ছিল যখন তাঁর শিক্ষার সংস্কার এই চরম লক্ষ্যকে ও তাঁর প্রগতির সাধনাকে বার বার বুদ্ধি বিচার দিয়ে মাপত। কি দেওয়া হল, কি পাওয়া গেল তার হিসাব কষত। অপরিণত বুদ্ধির বশে কখনও কখনও সন্দিহান হয়ে চলা থমকে যেত। কখনও

মায়ের বহু সঙ্গ করার পরও অনুভূতিতে আলো ও আনন্দের আভাস না পেয়ে অভিযোগ করে বলত—"এ আমার কি হল? আমি কেন আপনার কথা চিন্তা করব? এখানে আসা যাওয়া করব? আমি তো বেশ ছিলাম। খেতাম, ঘুরতাম—ইত্যাদি"। মা হাসতেন নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ আর ঘরে বাইরে কত আঘাতই ত ভাইজীকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু মায়ের করুণায় হৃদয়ের অন্তস্তলে মা-ই যে পরম আশ্রয় এ বোধ তিনি কখনও হারান নি, তাই সহস্র সংঘাত সত্ত্বেও মাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেননি। ভাইজীর অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে তিনি ত সবই সমর্পণ করেছেন তবু চরম অনুভব হৃদয়ে কেন ভরে থাকছে না, আর ঐ সময় মা প্রতিনিয়ত তাঁকে বুঝিয়েছেন যে আত্মসমর্পণের সাধনার পূর্ণ অভিষেকের এখনও অনেক বাকি। ভাইজী নিজেই বলেছেন—শরণাগতির প্রথম অবস্থায় একদিন সকালে প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে কাঁদতে কাঁদতে একটি গান তিনি লেখেন। গানটির নাম দিয়েছিলেন 'পাগলের গান'। ওই গানটি তিনি মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। পরে একদিন ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের কাছে মা ভাইজীকে বললেন—তোর 'পাগলের গান'টা গা তো। ভাইজীর গান গাওয়ার তেমন কোন অভ্যাস ছিলনা। তারপর সেখানে অনেক লোক উপস্থিত ছিল তাই তিনি দ্বিধা করতে লাগলেন। মা হাসতে হাসতে বললেন—"পাগলের গান লিখেছিস মাত্র, এখনও ত পাগল হতে পারিসনি।" ভাইজী বলছেন যে মায়ের কথাগুলি যেন হৃদয়ের প্রতিটি স্তর বিদীর্ণ করে দিল। সাধনার এই সময়টি বড় কঠিন। এক সময় হৃদয় হয়ত আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে, আবার পরক্ষণে কী এক গভীর অবসাদে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়। আনন্দ স্থায়ী হয় না। হৃদয়ে যে একটানা চরম অনুভবটি চায় তা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অধ্যাত্ম আনন্দের মাঝে কোথা থেকে লৌকিক বিষয়ের স্মৃতি ও ব্যবহার এসে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। ভাইজী একদিন দুঃখ করে মাকে বলেছেন যে—'আপনার এরূপ আশ্রয় পেলে বোধহয় পাথরও সোনা হয়ে যেত। কিন্তু আমার ত কিছু হল না'। মা পরম স্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে—"যে জিনিষটা গড়ে উঠতে বেশী সময় নেয় তা খুব পাকা পোক্ত হয়, সুন্দর হয়। তুই এত ভাবিস কেন? কেবল শিশুর মত হাত ধরে থাক।" ভাইজী বলছেন-"এত প্রবোধ, এত স্নেহ উপদেশ তবু ভিতরের শুষ্কতায় ঐ সময় ছট্ ফট্ করতাম। মায়ের অপার দয়া, অভাবনীয় স্নেহও, তাঁর চরণে আমাকে সর্বক্ষণ বেঁধে রাখতে পারত না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের নিত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কী কঠিন।" সত্যই কঠিন। শুধু কঠিনই নয়, যেন অসম্ভবও। তিনি কৃপা করে ধরা না দিলে জীব তাঁকে ধরতে পারে না। প্রতিটি সাধকই এক সময়ে অনুভব করে যে তিনি করুণা করে ক্ষুধারূপে অন্তরে জাগ্রত না হলে জীব তাঁকে চাইতেও পারে না। তাই তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে সাধকের কেঁদে কেঁদে বলতে হয়—আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছ নিজেরই সত্তা থেকে, কিন্তু দিয়েছ অদ্ভুত এক স্বাতন্ত্র্য বোধ, ও রেখেছ অজ্ঞানের আবরণে। এখন আমার আমি যে প্রকৃত ভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমারই এক অঙ্গ, এই সত্য উপলব্ধির 'ক্ষুধা' রূপে তুমি অন্তরে জাগ্রত হও। আমার অজ্ঞানের তমকে তুমি অপসারিত কর। লীলার কারণে আদি আবরণ যখন তোমারই দান, তখন আত্মানন্দ আস্বাদনের জন্য করুণা করে এই আবরণ তুমিই অপসারিত কর। এ ত জীবের সামর্থ্যে হবে না। জীব নিজের প্রকৃত অবস্থানটা অনুভব করে শুধু তাঁর চরণে প্রার্থনা রাখতে পারে। এর বেশি তার আর কি সাধ্য আছে?

ভাইজীর এই সময়ের ক্ষুধা, চোখের জল, প্রার্থনা, অভিমান, সকলের সমালোচনা, হতাশা সব যুগপৎ হৃদয়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। দ্বন্দ্বের বিহ্বলতায় তিনি এক এক সময় শ্রীমায়ের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন। কিন্তু বেশি দিন, বেশিক্ষণ নিজেকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না। একবার এই অবস্থায়

শ্রীমাকে দর্শনের তীব্র ব্যাকুলতায় শাহবাগের অনতিদূরে এক শিখ আখড়ায় গিয়ে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুতিন দিন সকলের অজ্ঞাতে শ্রীমাকে দর্শন করে আসেন। পরিণত বয়সের এক শিক্ষিত বিচক্ষণ মানুষের মনের এই গতি প্রবাহকে দেখে তিনি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন, কিন্তু অবাক হলেও তিনি অন্তরের ভাবের গতিকে রুদ্ধ করে রাখতে পারতেন না। হাওয়াতে যেমন করে একটা শুকনো পাতা তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে ভেসে যায় তেমন করে শ্রীমায়ের আকর্ষণে তিনি ভেসে যেতেন। তাঁর শ্রীমায়ের কাছে নিত্য যাতায়াত দেখে এই সময় আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য অনেকেই বহু কটাক্ষ করেন। নানা ভাবের সমালোচনা শুনে ভাইজীরও এক সময় মনে হয় যে সর্বদা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করা চিত্তের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুইত নয়। তিনি নিজের সাধন পথে অগ্রসর হবার জন্য একবার যোগবাশিষ্ঠ পাঠ ও বিচারের পথে মনঃসংযোগ করলেন। এর সাত আট দিন পর একদিন দুপুরে বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত কালীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসেন। দেখা হলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে বলেন যে, 'আমি নিরঞ্জন বাবু ও শশাঙ্ক বাবুর বাসায় গিয়েছিলাম, তাঁদের না পেয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। শুনেছি আপনি মা আনন্দময়ীর ভক্ত। বলুন তো মা কি রকম? তাঁর বিশেষত্ব কি?' এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে ভাইজীর দুচোখ জলে ভরে যায়, তিনি নির্বাক হয়ে থাকেন। তখন ভদ্রলোক বলেন যে আমি আমার জবাব পেয়ে গিয়েছি। এখন বলুন তো আপনি কেন কাঁদছেন। তখন ভাইজী বলেন যে–'এই কয়দিন আমি মার চিন্তা ছেড়ে অন্য বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্ম উন্নতির প্রচেষ্টায় আছি। আর আপনি এসেছেন আমার কাছে সেই মায়েরই খোঁজ করতে। আমি লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছি।' মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে ভাইজীকে তখনি তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হয় ও মায়ের দর্শনের পর তাঁর একান্তে থাকার সঙ্কল্প কোথায় ভেসে যায়। ভাইজী বার বার অনুভব করেছেন যে শ্রীমায়ের আকর্ষণ তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন অপেক্ষা না রেখে তাঁকে মায়ের শ্রীচরণে টেনে নিয়ে যেত।

ভাইজীর গৃহে তাঁর সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রথম সন্তান। সকলের বিশেষ আদরের হওয়ার জন্য তিনি স্বভাবে ছিলেন খুবই অভিমানী। ভাইজীর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রথমদিকে ভাইজীর মাতৃপূজার একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয়ে তিনি ছিলেন ভাইজীর প্রধান সহায়। পরে ভাইজীর স্ত্রী ভাইজীর সংসারের প্রতি উদাসীনতা দেখে আরও আগ্রহের সঙ্গে চেষ্টা করেন তাঁকে সংসারের মধ্যে ধরে রাখতে, কিন্তু মহাকালের ইচ্ছায় ঘটনা প্রবাহ ধীরে ধীরে ভিন্ন খাতে বইতে লাগল। জন্ম জন্মান্তরের পুনরাগমনের আর্বত থেকে বেরিয়ে নিজের শিব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভাইজীর হৃদয় তখন বৈরাগ্যে আকুল। বিরাটের আকর্ষণে তখন তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার সব দ্বন্দ্ব, চাওয়া পাওয়ার সব অভিরুচি হারিয়ে যেতে বসেছে। সংসার ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি ভাইজীর হৃদয় উদাসীন হয়ে গেছে। সংসারের প্রতি তাঁর এতটা উদাস ভাব কারও চোখেই ভাল লাগেনি। তাঁর স্ত্রীও অন্যের সমালোচনায় অধৈর্য হয়ে শেষে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন–একদিন অসহিষ্ণু হয়ে তিনি বলেন–'ঘরে বসে কি ধর্ম হয় না?' ছুটোছুটি করে, শরীরের উপর যথেচ্ছাচার করে, পুত্র কন্যার প্রতি অমনোযোগী হয়ে, এই ধর্ম না করাই ত ভাল। ভাইজী শান্ত হয়ে থাকেন। কোন উত্তরই তিনি দেন না। কারণ তাঁর নিজের এই অবস্থার কারণ তাঁর নিজের কাছেই এক দুর্বোধ্য অভিজ্ঞতা। তিনি তখন অন্তরে "সহজ উদাসী"। তাঁর কাছে তখন সবাই আছে, সবই আছে, পদ্ম পাতার ওপর জলের মত।

এক সময় এমন হল যে সকলের বিরূপতা, সমালোচনা ভাইজীর ভাবের উপর বিশেষ কোন

প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতনা। তাঁর সাধক হৃদয় তখন বিরাটের ছোঁয়া পেয়ে আকাশবৎ নির্বিকার হয়ে গেছে। এমনটাই হয়। জীবতনু পঞ্চভূতে গড়া। ভাব ভোগপ্রবণ হলে পঞ্চভূতের অদিব্য গুণ তাঁর সাথী হয়। 'ক্ষিতি'র জড়ত্ব, 'অপে'র বাঁধহীন ইতস্তত গতি, 'অগ্নি'র সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা, 'বায়ু'র নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করার প্রবণতা ও 'আকাশে'র শূন্যতার বোধ—জীবের মন বুদ্ধি অহংকে বিক্ষুব্ধ, অশান্ত, অতৃপ্ত করে রাখে। সেই সাধক যখন তার ভাবপ্রবাহকে আত্মউপলব্ধির পথে সুনিয়ন্ত্রিত করতে চায়, তখন পঞ্চভূতের দিব্য গুণ তার সহায় হয়ে তাকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'ক্ষিতি' তখন সাধককে দান করে তার অচল, অটল সুমেরুবৎ স্থৈর্য, যে স্থৈর্য—মন, বুদ্ধি অহংকারেও সংক্রামিত হয়। 'অপে'র অবাঞ্ছিত গতির পাশে তখন আলের আড়াল, পাড়ের বাধা পড়ে তাঁর গতিকে সাবলীল, সুনিয়ন্ত্রিত করে। 'অগ্নি'র উর্ধ্বমুখীনতা তাকে ভূমার দিকে বিরাটের দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখার জন্য উৎসাহিত করে। অগ্নিশিখা কখনও নিম্নমুখী হয় না, সে সদাই উর্দ্ধমুখী। আবার অগ্নির তাপ তাকে তাপ সহিয়ে দেহকে যোগাগ্নিময় করে তোলাতে উদ্বুদ্ধ করে। মা বলেন—'তাপ সওয়াই ত তপস্যা'। আরও অগ্নির আলো অজ্ঞানের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে রাখে। আলো কত ভাল, আলোর মাঝেই অনুষ্ঠিত হয় কল্যাণের যত যজ্ঞ, আর যত অকল্যাণকারী ক্রিয়া তা অনুষ্ঠিত হয় অন্ধকারে। আলোয় বাস, আলোর সঙ্গ, আলোর ধ্যান, দৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছতা এনে দেয়। শ্রেয় প্রেয়ের বিবেক জাগ্রত হতে থাকে। সাধক এই সময় বিপুল উৎসাহ বোধ করেন ও আরও এগিয়ে চলেন। তখন 'বায়ু' তাকে দান করে ব্যাপ্তির অনুভব। শুধু নিজের সুখের জন্য যখন ভাব ভাবনা সঙ্কুচিত হয়, তখন জীব পায় মৃত্যুর দিকে গতি। আর ভাবনা যখন সকলের সুখের জন্য হয় তখন জীব পায় অমৃতের দিকে গতি। নিজের সুখের ভাবনাকে ছাপিয়ে সকলের সুখের ও আনন্দের জন্য হৃদয়ের প্রসারতার মধ্যে আছে অমৃতত্বের বীজ, মুক্তির স্বাদ। বায়ু এই ব্যাপ্তির অনুভব শেখালেও সে নিজে মাধ্যাকর্ষণের সূক্ষ্ম শক্তিতে বাঁধা পড়ে। এই সময় সাধকের বহু স্থূল সংস্কার বিগত হয়ে গেলেও কিছু কিছু সূক্ষ্ম সংস্কার তাকে তখনও সংসারের দিকে ধরে রাখে। সাধন পথে এ এক কঠিন স্থান। নিজের স্থূল ভোগের চাওয়া থেকে নিবৃত্তি পেলেও মন কাঁদে যে আমি মরে গেলে, চলে গেলে, আমার ওপর যারা নির্ভর করে রয়েছে তাদের যে বড় ব্যাথা লাগবে। তাদের সে কষ্ট দেওয়ার অধিকার কি আমার আছে? আসলে এ ভাব সাধকেরই হৃদয়তন্ত্রীতে সংস্কারের এক সূক্ষ্ম বাধা। সে তখনও 'কর্তাপনা' থেকে অব্যাহতি পায় নি। সে তখনও বোধে বোধ করতে পারেনি যে ভগবানই সকলের ভর্তা। এই সময় সাধক যদি তীব্র সংবেগ নিয়ে ভগবৎকরুণা প্রার্থনা করে তখন 'আকাশে'র নির্বিকার, ভূমা বোধে সে আপূরিত হয়। আকাশ—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবাইকে বুকে ধরে রয়েছে, কিন্তু কারও সঙ্গে সে জড়িয়ে নেই। সে বিরাট, সে সুখে দুঃখে নির্বিকার। তার বুকে কালি ছেটালে সেখানে কোন রং ধরেনা। এই সেখানে মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষণ, আবার পরক্ষণেই যেমন তেমনি। ঋষিরা আকাশের মধ্যে ব্রহ্মের আভাস দর্শন করে তাই বলতেন—'খং ব্রহ্ম'। মা আমাদের শেখাতেন—'আর কিছু না পারিস খালি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবি'। মা ত জানেন, ঐ আকাশের শূন্যতা আসলে শূন্যতা নয়। পূর্ণতারই অপরিচ্ছিন্ন রূপ। সে সব রং, সব রূপ, সব গুণ, সব বিকারকে বুকে ধরে নিজে নির্বিকার হয়ে বিরাজ করছে। সাধক তার সঙ্গগুণে 'আমি' ও 'আমার' এই দুই দুর্লঙ্ঘ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মা আরো বলতেন—"সাদা সব রূপ নিয়েই অরূপ হয়ে আছে", কি সুন্দর কথা! রামধনুর যত রং সব ত সংহত হয়ে থাকে ঐ সাদার ভিতরেই। তেমন করে যিনি বিরাট, যিনি অনন্ত, যিনি ব্রহ্ম, তিনি সব

বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাকে সম ভাবে গ্রহণ করে নিজে রয়েছেন–অরূপ, নির্গুণ, নিরূপ, পূর্ণ আত্মা হয়ে। এই দিকে খেয়াল রেখে তাই ত ভাইজী আমাদের বললেন–তাঁর নিকট যে যত শূন্য দেহ ও মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হতে পারে সে তত সহজে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রকৃত শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার নিরালম্ব সহজ প্রকাশ। নিজের মনের সঙ্কল্প বিকল্পের ঘড়া যে সাধক যতখানি খালি করতে পারে, ভগবানের আনন্দময় সত্বা অনুভবের পথে সে তত সহজে অগ্রসর হয় ও অন্তিমে পূর্ণতা আস্বাদন করে।

ভাইজীর ভাবনাকে জানাই আমাদের সকলের প্রণাম, তাঁর অনুভব ও বাণীকে আমাদের সকলের প্রণাম। জয় মা।

মাতৃ-সংগ্রহালয়ে

—শ্রী শৈলেশ ব্রহ্মচারী

সংগ্রহশালা হল উদ্‌ঘাটন
ভিতরে প্রবেশ করি
শিহরি উঠিল চিত্ত ও তনূ
কী যে কহি,–মরি! মরি!!
চমকিয়া হেরি দক্ষিণে–বামে
মার লীলা–সম্ভার
রয়েছে ছড়ায়ে, অঙ্গে জড়ায়ে
শত ইতিকথা তার।
বিষ্ময়ে হেরি,–সেই শাহবাগ,
রমনার কালীবাড়ী,
সম্মুখে সেই যুগল-বৃক্ষ,
সেই সিদ্ধেশ্বরী।
অদূরেই হেরি ভোলানাথ আর
ভাইজীরে সাথে করে
স্বয়ং জননী আছেন দাঁড়ায়ে
বাঁধি কেশচূড়া শিরে।
সুস্মিত তাঁর বদন কমল,
দুনয়নে স্নেহ ধারা,
ডাকিয়া কহেন,–আমি আছি হেথা
মেলে নাই বুঝি সাড়া।
বিস্ময়োপরি আরো বিস্ময়,
দক্ষিণে ফিরে দেখি,

তুলদান মাঝে বসিয়া জননী
নিমিলিত দুটি আঁখি।
ধ্বনিত হতেছে বেদের মন্ত্র,
শোভিছে পতাকা সারি,
অপলক চোখে হেরিছে পুলকে
অগণিত নরনারী।
সে সুদূর দিনে যাঁরা কাছে ছিল,
যাঁরা বলেছিল–শোন,
ঈশ্বরে কভূ দেখেছ কি চোখে?
করেছ কি দর্শন?
যাঁরা ভুলেছিল মায়া মানবীর
সেই অবগুন্ঠনে
তাঁরাও হেথায় বিষ্ময়াহত
স্তব্ধ তুলীর টানে।
এমনি কত না হারানো দিনের
মুছে-আসা ইতিহাস
হেথা অম্লান–করিতেছে বুঝি
অতীতেরে পরিহাস।
সে সব [illegible], মহার্ঘ-গাথা
গাহিতে শকতি নাই,
তাই বিস্ময়ে আপনা হারায়ে
শুধু দেখি–দেখে যাই।

স্মৃতিচারণ

(দশ)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

১২ই আগষ্ট, ১৯৪৬–

ঝুলন পূর্ণিমার কীর্তন, ভোগ, আরতি, খাওয়া দাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল। তারপর দিদি আগামী কাল রওনা হবার জন্য packing আরম্ভ করলেন। আমি সঙ্গে আছি। সারারাত ধরেই জিনিষ গোছাতে হল। মায়ের গতিবিধি ত ঠিক থাকে না–দিদি সবরকম ভাবে যথাসাধ্য প্রস্তুত থাকবার চেষ্টা করেন। মুখ ধোবার বাসন থেকে রান্নার বাসন, বাল্টি, ঘটি, রান্নার কিছু কিছু উপকরণ যাতে দরকার হলে সামান্য ভোগ রেঁধে মাকে দিতে পারেন। কারুর কাছে কিছু চাওয়া, মা পছন্দ করেন না। যদি সুবিধা করে দিল ত ভাল তা না হলে দিদিকেই যোগাড় রাখতে হয়। তারপর দিদির famous 'কালা বাক্স'। কতরকমের খুঁটি নাটি জিনিষ ভাগে ভাগে pack করা। কখন কি প্রয়োজন হবে কে জানে। চিঠির বিরাট থলি। দিদি সুযোগ পেলেই দু-একটি চিঠি শুনিয়ে বাণী note করে নেন এবং চিঠির জবাব দিয়ে দেন। দিদির এই সেবাকার্যের ভক্তরা যথেষ্ট মাহাত্ম্য দেয় কিনা কে জানে।

ভোর হয়ে এলে অন্যান্য কাজে সকলে গেলাম। ৮টার মধ্যে সকলে রওনা হয়ে যাবে। আমরা কয়েকজন পরে মার সঙ্গে যাব। গন্তব্যস্থল দেরাদুন। দিল্লী গিয়ে train ধরা হবে। মা বলেছিলেন ১০টার মধ্যে রান্না খাওয়া শেষ করতে হবে। দিদির সঙ্গে আমি আছি, মা হরিবাবার সৎসঙ্গে চলে গেলেন। শ্রী কৃষ্ণপ্রেম ও মতিরাণী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন মার প্রতীক্ষায়, কিন্তু আজ আর দর্শন হল না।

অমলদার মোটরে আমরা প্রায় ১২টার সময় রওনা হলাম। পটলদা ও মোহনানন্দজী সামনে বসলেন। কাল সারারাত ঘুম হয়নি বলে মা বলছেন, "ঘুমিয়ে নে"। মা নিজেই আমার উপর হেলান দিয়ে চোখ বুঝলেন। গিনি পায়ের কাছে বসেছিল। তাকে বললেন, "রেণুর হাঁটুতে মাথা দিয়ে ঘুমা।"

ঘুম ত কত হল কিন্তু বেশ আনন্দে রাস্তা কেটে গেল। এক জায়গায় মোটর থামালে মা অনেকক্ষণ হাঁটলেন। বললেন, "তাড়াতাড়ি পৌঁছে কি হবে"।

Delhi Railway Station এ বহুলোক মাকে see-off করতে এসেছেন। মোহনানন্দজী যাবার সময় মাকে ৩০টাকা দিয়ে গেলেন। মা অমলদাকে ওই টাকা দিয়ে ফল কিনতে বললেন। বললেন, "সাধুর টাকা, সাধুর হাতের প্রসাদ মনে করবে"। আমাকে দিয়ে ওই ফল বিতরণ করিয়ে দিলেন।

গাড়ী ছাড়বার আগে নিজের compartment এ এসে ওপরের একটি berth এ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙ্গল একেবারে হরিদ্বার station এ। Station এ নেমে মুখ ধুয়ে এক কুল্হড় চা খেলুম। আমার চা খাবার অভ্যাস যদিও নেই, এই ঠান্ডায় এবং লম্বা journeyর পর ভালই লাগল।

দেরাদুন stationএ হেমবাবু এসেছেন, যদিও তাঁকে খবর দেওয়া হয়নি। তিনি নাকি কাল সারাদিন মাকে দেখেছেন যে মা বাসে করে travel করছেন। আন্দাজে আন্দাজে stationএ এসে মাকে পেয়ে খুব খুশী। মার আর গুপ্তভাবে থাকা হল না। সবাই খবর পেয়ে গেল। কিষণপুরে পৌঁছে মা বললেন, "এখানে জিনিষ

খুলো না–রায়পুর যাব"। বোধহয় একান্তে থাকবার উদ্দেশ্য। মা বললেন, "বিল্লো ও রেণু এখানেই থাকুক"। আমি আচমকা এই আদেশের জন্য প্রস্তুত না থাকায় একটু বিচলিত হয়ে গেলাম ও কান্না এসে গেল। কান্নাকাটি মা একেবারেই পছন্দ করেন না এবং আমার স্বভাবও নয়। মা মাথায় পিঠে হাত দিয়ে একটু বোঝালেন, আমিও ততক্ষণে সামলে নিয়ে খাবার যোগাড় করতে লাগলুম। বিল্লোজী বেশ শান্ত ও গম্ভীর–কোনও চাঞ্চল্য নেই। ওইরকমই হওয়া উচিত।

এখানে কি ভাবে থাকতে হবে, মা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলে দিলেন। আমি মার 'মৌনও' রক্ষা করি। (সারা সপ্তাহ মৌন, বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা অবধি কথা বলা। মা গত বছর বিন্ধ্যাচলে আরম্ভ করেছিলেন বোধহয় জানুয়ারী মাসে)।

১৭ই আগষ্ট ১৯৪৬–

প্রায় রোজই দিদির লেখা note পাই লোক মারফৎ। আমার 'মৌন' কয়েকদিন বিল্লোজী করবে। আশা হচ্ছে হয়ত মা অন্যত্র যাবার আগে এখানে হয়ে যাবেন।

হঠাৎ দেখি শের সিংজী সপরিবারে। তারা শুনেছে যে মা আসবেন। ব্যস আমাদের আনন্দ দেখে কে? কিছুক্ষণেই মা, কুসুম ও ভূপেনকে নিয়ে এসে পৌঁছালেন। শুনলাম, রায়পুরে কীর্তন হচ্ছিল, মা হঠাৎ বললেন, "চল, কিষণপুরে গিয়ে কীর্তন করবে"। অমনি রওনা। বৃষ্টিতে পাহাড়ী নদী ভরে উঠেছে। মা শুধু ছেলেদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়ে এসেছেন। দেরাদুন শহর থেকে রায়পুর যেতে প্রায় তিন চারটি পাহাড়ী নদী পড়ে।

এখানে এসেই খুব জোর কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেল। লোকজনও বেশ হয়েছে। কি রকম করে সবাই খবর পেয়ে গেছে। প্রায় ১২টা অবধি কীর্তন হল। মায়ের জন্য ধ্যান মন্দিরে জায়গা করে দেওয়া হল।

রাত্রে শোওয়া নিয়ে একটু গোলমাল হল। মা প্রথমে বললেন, "মেয়েরা যে যার জায়গায় নীচে শোবে"। দিদি আমাদের হয়ে একটু বলাতে মা রাজি হলেন। তাহলে ছেলেদের নীচে যেতে হয়। দিদিমা বলছেন, "এত গোলমালের দরকার কি। আমিই না হয় কাছেই শুই"। অমনি দিদি বলছেন, "তুমিত বাপু দশমাস পেটে ধরেছিলে তখন আমরা কেউ ভাগ বসাতে আসিনি। এখন বাপু তুমি ভাগ বসাতে আস কেন?" এই হাসাহাসির মধ্যে মা সবাইকার যথাযোগ্য শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা কাছাকাছি রইলাম, ছেলেরা দূরে দূরে বিছানা পেতে শুল।

রাত দুটোয় শুয়ে ভোর চারটেয় উঠে পড়লুম। অনাদি ভাঙ্গা গলায় একলাই উষা কীর্তন করছে। আমি মার মুখ ধোবার যোগাড় করছি এবং অন্যান্য কাজ করছি। মা একটু বকলেন যে কীর্তনে যোগ দিইনি। সত্যিই, আশ্রমের নিয়ম পালন করবার প্রতি আমাদের নিষ্ঠা নেই। মায়ের কাছাকাছি থাকতে পারলেই আনন্দ। মা সকালে একটু তালমিছরির জল খেলেন ও ইঁট গরম করে পায়ে সেক দিলুম। সেই সময় মা কুসুম ও ভূপেনকে অনেক উপদেশ দিচ্ছেন, তাই আমিও শুনতে পেলাম। "হ্যাঁ, এ পথে আসলে মা, বাবাকে ছাড়তে কষ্ট-ত হয়ই। তাঁরা কষ্ট পান। তবে এদিকের ইচ্ছা প্রবল হলে কোন বাধাই টেঁকে না"। মোহনানন্দজীর আদর্শ দেখালেন। প্রথমে পিতামাতা খুব কান্নাকাটি করেছে, পরে তারাই আবার ছেলের গুণগান করে আনন্দ করেছে। গোবিণের (প্রান্দগোপালবাবুর ছোট ছেলের) কথাও বললেন।

মা সারা সকাল private করলেন। আমাদের বললেন, "তোরা কয়জন মিলে ৯টা থেকে রোজ কীর্তন

করবি।"

ভোগ হলে মা অল্প একটু বিশ্রাম করলেন, তারপরেই যাবার সময় বৃষ্টি নামল। মার জন্য কোনও আশ্রমেই bathroomএর ভাল ব্যবস্থা নেই। মা সত্যিই কি যে কষ্ট করেন। যার জন্য এত ব্যাপার তাঁকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে টিনের চালার ব্যবস্থায় বাইরে যেতে হয়, আশ্চর্য! আমি ছাতা নিয়ে সঙ্গে গেলাম। মাকে যথাসাধ্য আড়াল দিয়ে নিজে স্রেফ ভিজতে লাগলুম। মা আসতে যেতে অনেক কথা বললেন। কি ভাবে আশ্রমে থাকতে হবে। পিঠে ব্যাথার জন্য তোষক তৈয়ারী করে নিয়ে শুতে বললেন। বারে বারে বললেন যাতে আমি এতে ঢিলা না দিই।

বৃষ্টিতেই মা রওনা হলেন। আমরা ও ভিজতে ভিজতে মোটরের কাছে কাছে কিছুটা গিয়ে শূন্য আশ্রমে ফিরে এলাম।

২৭শে আগষ্ট ১৯৪৬—

আশ্রমে অনেকেই আসছেন। বিন্দুদি অসুস্থ। আমার সময় রান্না ও পরিবেশনেই কেটে যায়। সকাল সাতটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার routine। বিকেলেও রান্না ও পরিবেশন। বিন্দুদিকেও কিছুটা সময় না দিলে তার ভাল লাগে না। জপ, ধ্যানের জন্য অতিকষ্টে চার পাঁচ ঘন্টা বার করে নিই। দিদি টাকাকড়ির ভারও এবার দিয়ে গেছেন, হিসাব রাখতে হয়। আমি ত এই কাজটিকে বাঘের মত ভয় পাই- -পরের টাকা ঠিকমত ব্যবস্থা না করতে পারলে মহা মুস্কিল। আমার কৃপণ বলে দুর্নাম হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু গচ্ছিত টাকায় যদি কুলিয়ে উঠতে না পারি, সেই ভয়ে অতি সাবধানে খরচ করছি।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্ম–সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব

(প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ)

—আচার্য্য বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১/২/১)

শ্রুতিশাস্ত্রে সর্বত্র ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ,
উপনিষদে সর্বত্র ঈশ্বর-ধ্যানের আদেশ।
ব্রহ্মই বিজ্ঞানময় পরমাত্মা হন,
পরমাত্মা উপাস্য, জীবাত্মা নন।
ঈশ্বর উপাস্য, জীবাত্মা উপাসক,
জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশ, ব্রহ্মই শাসক।
দুই থেকে চার সূত্রও সমর্থন করে,
গীতাতেও কহে, জীব ঈশ্বর হতে না পারে।
জীবাত্মা অক্ষর পুরুষ, ব্রহ্ম পুরুষোত্তম,
পুরুষোত্তমের উপাসনা মুক্তির সাধন সর্বোত্তম।

সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষাৎ (১/২/৮)

পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান,
পরমাত্মা সুখদুঃখ ভোগ নাহি করেন।
সুখদুঃখ ভোগ জীবের ভাগ্যে জোটে,
প্রারব্ধ ক্ষয় হলে সুখদুঃখ মেটে।
জীবাত্মাও চৈতন্যময়, কিন্তু হন অনু,
পরমাত্মা পূর্ণ চৈতন্য, হলে তিনি বিভু।

অত্তা চরাচর গ্রহণাৎ (১/২/৯)

অত্তাধিকরণ অনুসার ব্রহ্ম জগতের অত্তা,
তবে কি জীবের মত ব্রহ্মও ভোক্তা?
জীব হয়ে ভোক্তা, ব্রহ্ম ভোগ করান,
তা হলে তো ব্রহ্ম ভক্ষণকারী নন।
হৃদয়গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মই সংহার-কর্ত্তা,
অত্তা মানে কর্মফল ভোক্তা নন, তিনি লয়-কর্ত্তা।
সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের কারণ পরমেশ্বর হন,
অতএব তিনিই তো জগৎকে ভক্ষণ-করেন।
সংহারকারী রুদ্র-দেহে বিশ্বলয় হয়।

মৃত্যুর মৃত্যু যিনি, তাঁর দেহে প্রলয়।
চরাচর লাভ নির্বাণ পরব্রহ্মের দেহে,
জগতে গ্রাসেন রুদ্রাণী কালী পরম স্নেহে।
দশ থেকে তের সূত্রও সমর্থন করে,
দ্রষ্টা ভগবান অনুমন্তা, ভোগ নাহি করে।

অন্তর উপপত্তেঃ (১/২/১৩)

চক্ষুমধ্যে যে পুরুষ হন দৃষ্ট, তিনি পরমাত্মাই,
চক্ষু-অভিমানী হিরণ্যাক্ষ পুরুষ পরব্রহ্মাই।
সকল ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত দেবতার নিয়ন্তা ব্রহ্ম।
পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত দেবতারাও তো ব্রহ্ম।
পরব্রহ্ম সুখ-স্বরূপ, হন আকাশ–স্বরূপ,
'প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম' বলেন এইরূপ।
সুতরাং তিনি সুখ-স্বরূপ বলেই পরব্রহ্ম,
শ্রুতির তত্ত্ব ও অক্ষিপুরুষ জ্ঞাতার গতি একই ব্রহ্ম।

অন্তর্য্যাম্যাধি দৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ। (১/২/১৯)

অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে কভু,
অমৃতময় সর্বনিয়ন্তা, হন ব্রহ্ম বিভু।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ (১/২/২২)

ব্রহ্ম হন অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অশ্রোত্র,
অচক্ষু, অপানি, অপাদ, নিত্য, ব্যাপক, সর্বগত।
তিনি হন অব্যয়, অতি সূক্ষ্ম, ভূতগণের যোনি,
প্রকৃতি বা জীবাত্মারে আদিকারণ না মানেন জ্ঞানী।

বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষাৎ (১/২/২৫)

অশ্বপতি আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় বলেছেন–
বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পরমাত্মাই হন।
মানবদেহও বৈশ্বানর, মানবাত্মাও বৈশ্বানর,
বৈশ্বানরকেই, আহুতি দেয়, আহার যখন করে নর।
বৈশ্বানর সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যা হয় ব্রহ্মার ধর্ম,
জীবের ধর্ম নহে ইহা, জানেন ধীর এই মর্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা কথা

—ডঃ বীথিকা মুখার্জী

(ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী দ্বারা ইংরাজী হইতে রূপান্তরিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুলতানপুরের শ্রী রমাকান্ত ভট্টাচার্যের পরিবারে তৃতীয় প্রজন্মের কন্যা ব্রহ্মচারিণী চন্দন শ্রীশ্রীমায়ের স্বমুখে তাঁর আবির্ভাব বৃত্তান্ত শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন। দিদিমা ও দাদামহাশয়ের মধ্যবর্তিনী নবজাতিকা মায়ের কথায় তাঁর মনে উদয় হয় ত্রিবেণী সঙ্গমের উপমা। বিশেষতঃ ত্রিবেণীর তৃতীয় ধারা সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী এবং অন্তঃসলিলা, লোকলোচনের অগোচরা। উপমাটির বিশেষ সার্থকতা এইখানেই।

নবজাতিকার নাম রাখা হল নির্মলা সুন্দরী। লীলারম্ভ থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের এই নামের সার্থকতা সর্বৈক ভাবে প্রমাণিত হয়। শিশুরূপী মা দর্শনমাত্রেই সর্বজনের মনোহরণ করতেন। ক্ষুদ্র বালিকাটিকে একটিবার মাত্র দেখলে পর দর্শনকারী এমনই অভিভূত হতেন, মুগ্ধ হতেন যে সহজে তার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে পারতেন না। এমনকি অচেনা অজানা লোকও তাকে দেখে দাঁড়িয়ে পরত। তাকে একটু আদর করে তার সাথে একটু খেলা করে তবেই যেত। শিশু নির্মলার মা এ দৃশ্য দেখায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তবে একদিনের একটি ঘটনা তাঁর স্মৃতিপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যাকূটে গিয়েছিলেন। একদিন দেখেন যে এক অসাধারণ পুরুষ, শরীরে দিব্য জ্যোতির আভা, তাঁর শিশু কন্যার কাছে উপস্থিত। মাত্র দশমাস বয়সের নির্মলা তখন আপন মনে খেলায় মগ্ন। আগন্তুক শিশুর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন, যেন প্রণাম নিবেদনের ভঙ্গিমায়। তারপর অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দিদিমাকে বললেন, "এই যাকে দেখছ, এ মা, জগতের মা, ঘরে রাখতে পারবেনা। থাকবেই না।" মোক্ষদা দেবীর মনে হল আগন্তুক ব্যক্তিটি বুঝি কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক। তবে ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গেল।

খেওড়া — বাল্যলীলার পটভূমিকা

খেওড়া গ্রামটি ক্ষুদ্র। গ্রামের পশ্চিম ভাগে সেকালে মাত্র দুইটি ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস ছিল এবং সে অংশটুকুর তিনদিক ঘিরে ছিল বেশ কিছু মুসলমান পরিবারের বাসস্থান। পূর্বদিকে আরো কিছু হিন্দু পরিবার বাস করতেন। উভয় বসতির মধ্যখানে ছিল বিশাল মাঠ ও বনভূমির ব্যবধান। মুসলমান বসতির মাঝখান দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পথ ছিল। ছোট্ট নির্মলার যখন হাঁটাচলার বয়স হল, তখন থেকে সে এই পথ ধরে আপন মনে নেচে খেলে চলে যেত এবং প্রতি গৃহের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হত। সেখানে সে কাউকে নানা, কাউকে চাচা, কাউকে দাদা, কাউকে বুআ ইত্যাদি বলে অনায়াসে সবার আপন হয়ে যেত। এইভাবে গোটা গ্রামখানিই বালিকা নির্মলার আত্মীয়তায় এক বৃহৎ অবিভক্ত পরিবারে পরিণত হয়েছিল।

নির্মলার মিষ্টিমধুর স্বভাব সবাইকে কাছে টানে। কেউ কোন কাজ করতে বললে সে হাসিমুখে করে

দেয়। যার যা প্রয়োজন, তাকে বললেই সে সহজ সরল ভাবে সাহায্য করে দেয়। ছোটখাট জিনিষপত্র নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া, হাতে হাতে কাজ এগিয়ে দেওয়া–শুধু যে তার পরিবার বর্গকে সে এভাবে সাহায্য করত তাই নয়, তার পাড়া প্রতিবাসিগণও তার থেকে এ ধরণের সাহায্য পেত। সর্বদাই তার হাসিমুখ, প্রসন্ন ভাব, কখনও কাউকে বিরক্ত করেনা। এমনকি তার মায়েরও মনে পড়ে না কখনও সে রাগারাগি বা কান্নাকাটি করেছে বলে। তবে তার কান্নার দুটি ঘটনা তিনি ভুলতে পারেন নি। নির্মলার জন্মের পর তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন সাত বছর বয়সে পরলোক গমন করে এবং অন্য দুজনও নিতান্ত শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরম ধৈর্য ও সহ্যের প্রতিমা মোক্ষদা দেবী কখনও কখনও এই অসহনীয় দুঃখে কাতর হয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতেন। এ অবস্থায় নির্মলা তাঁকে দেখে ফেললে সে এমনই আকুল ক্রন্দন আরম্ভ করত যে তিনি মেয়েকে শান্ত করতে গিয়ে নিজের ক্রন্দন সংবরণ করতে বাধ্য হতেন।

অন্য ঘটনাটি ঘটে মায়ের নিতান্ত শিশুকালে। একাব্বর নাম্নী এক মুসলমান বালিকা। এক প্রতিবাসীর মেয়ে। নির্মলাকে খুব ভালবাসত ও প্রত্যহ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে আসত। একদিন সে নির্মলার সঙ্গে এক নতুন খেলা শুরু করল। কিছুদূর থেকে সে হাতের ইশারায় নির্মলাকে ডাকে, নির্মলা হাসতে হাসতে হামা দিয়ে এগোয়, তখন একাব্বর দুষ্টুমি করে গুটিগুটি পিছু হটে আবার হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকে। এইভাবে চার পাঁচ বার তার সাথে ছলনা করার পর নির্মলা মাটিতে বসে পড়ল আর উচ্চস্বরে রোদন আরম্ভ করল। একাব্বর এই দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে কোলে তুলে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু নির্মলার কান্না উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমনই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল, যে ভীত একাব্বর দ্রুতগতিতে তাকে নিয়ে তার ঠাকুরমার কাছে পৌঁছে দিল। অতঃপর সে আর কখনই নির্মলার সঙ্গে এধরণের খেলা খেলবার সাহস করেনি। যখন দুজনেই বড় হল, তখনও একাব্বর মাঝে মাঝে নির্মলাকে তার ছোটবেলার এই কথা মনে করিয়ে দিত। বলত, "কী মেয়ে বাবা! কী ভীষণ কান্না! মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়!"

এই শিশু কন্যাটির ব্যাপারে অন্য অনেকেরই বহু আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হয়। খেওড়া গ্রামে অবস্থান কালে তার ঠাকুরমার বয়সী অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা মাঝে মধ্যে দেখা করতে আসতেন। গ্রাম সুবাদে তাঁরা সবাই ছিলেন নির্মলার ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা। এমনই এক ঠাকুরদা (শ্রী কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য) প্রায়ই ছোট্ট নির্মলাকে কোলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে আবার দুহাতে লুফে নিয়ে খেলা করতেন। এই মজার খেলায় নির্মলাও খুব আহ্লাদিত হত আর খিলখিল করে হাসত। একদিন বৃদ্ধ যখন তাকে তুলে ধরেছেন, সে তার একটি পা বৃদ্ধের স্কন্ধে স্থাপন করে অন্য পা টি তাঁর বাহুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ বৃদ্ধ ঠাকুরদা 'ধর, ধর' বলতে বলতে পড়ে যাওয়ার অবস্থায় মাটিতে বসে পড়লেন। তিনি যে কেন 'ধর, ধর' বললেন, কাকে ধরতে বললেন, নির্মলাকে না কি তাঁকেই–তা তিনি পরে সঠিক বলতে পারেন নি। তবে যে কথা সকলের মনে হল তা এই যে শিশু নির্মলার ভার হঠাৎ এত বেড়ে গিয়েছিল, যে ঠাকুরদার পক্ষে নিজেকে সামলানো দায় হয়ে পড়েছিল। তিনি ভীতিবিহ্বল অবস্থায় নির্মলাকে মাটিতে নামিয়ে বললেন, "বাবারে বাবা, কী মেয়ে!"

নির্মলা যেমন-যেমন বড় হয়, তার স্বভাবের বিশেষ লক্ষণীয় দিক গুলি সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই লক্ষ্য করে যে এ মেয়েটি কেমন মধুর স্বভাবের, সর্বদা কেমন হাসিখুশি, যে যা করতে বলে, সব হাসিমুখে করে দেয়, তার কাছে আপনপর, বড় ছোট, জাতি ধর্ম–কোনও কিছুরই ভেদ নেই। আর নির্মলার

কাছে তো সব কিছুই ছিল আনন্দময়। এক রাত্রে প্রচন্ড ঝড় উঠল, ঝড়ের বেগে ঘরের চালের একাংশ উড়ে গেল, নির্মলা হাততালি দিয়ে হেসে মাকে বলল, "মা দেখ দেখ, ঘরের ভেতর বসেই কি সুন্দর তারা দেখা যাচ্ছে, বাইরে যাওয়ার আর দরকার নেই, বাইরে-ভেতরে সব এক হয়ে গেছে!" গ্রীষ্মের উত্তাপ, শীতের কন্‌কনানি বা বর্ষার উপদ্রপ কোন কিছুই নির্মলাকে ব্যতিব্যস্ত করে না, তার প্রসন্নভাবে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনা। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে সে খুশিতে নাচে, গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচন্ড রোদের মধ্যে সে বালুকাস্তুপের ওপর লাফিয়ে ঝাপিয়ে খেলা করে। শিশুসুলভ কোন দুঃখ কষ্টই তাকে স্পর্শ করে না। তার এই সদানন্দময় স্বভাব দেখে পাড়াপ্রতিবাসী তাকে নানা নাম দেন, যেমন হাসি, খুশির মা, ইত্যাদি।

নির্মলার যে গুণটি সকলকে ভাবিয়ে তুলত, তা হল তার অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করার স্বভাব। বড়রা যেমন-যেমন আদেশ করেন, নির্মলা তা হুবহু পালন করে। এর ফলে তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বড়দের সদা সতর্ক থাকতে হয়, কারণ অসাবধানতা বশতঃ বা খেলাচ্ছলে কিছু বললেও নির্মলার "আদেশ পালনে"র ফ়লে তা সত্য হয়ে যাবে। একদিন মা তাকে একটি পাথরবাটি দিয়ে বললেন পুকুরের জলে ধুয়ে আনতে। নির্মলা আপনভোলা মেয়ে, তাই তাকে সাবধান করে দেবার জন্যই মা বললেন, "দেখিস্, পারলে ভেঙ্গে নিয়ে আসিস"। কিছুক্ষণ পর নির্মলা ফিরল, পাথরবাটির ভাঙ্গা টুকরোগুলি তার ছোট্ট হাতে করে। সে মাকে বলল, বাটিটি তার হাত থেকে আপনা হতে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। মা অতিকষ্টে হাসি চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করলেন, সে টুকরোগুলো কেন নিয়ে এসেছে। নির্মলা বলল, সে দেখেছে, পাথরের বাসনের ভাঙ্গা টুকরো পোড়া ঘা সারাতে ব্যাবহার করা হয়, তাই যদি কারো কাজে লাগে। সেইজন্য খন্ডগুলো সে কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। নির্মলা অত্যন্ত সরল ও সত্যবাদী, তাই তার কথায় অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ছিলনা।

নির্মলার ছোটবেলার আর একটি কৌতুকোদ্দীপক গল্প হল 'দাঁড়ি'র গল্প। লেখাপড়া শেখাবার সময় তার বাবা তাকে বলেছিলেন যে সম্পূর্ণ বাক্য পড়া হলে দাঁড়িতে এসে থামতে হয়। দাঁড়ি চিহ্নে থামার পর আবার নতুন বাক্য পড়া আরম্ভ করার নিয়ম। কিছুদিন পর বাবা দেখলেন নির্মলা কেমন করে তাঁর এই আদেশ পালন করছে। দেখে যেমন তাঁর হাসি পেল, তেমনি তিনি ভীত হলেন। তিনি দেখলেন, বাক্য পুরো না করে নির্মলা কোথাও থামেনা। যখন কোন দীর্ঘ বাক্য পড়তে হয়, তখনও কোথাও না থেমে অতিকষ্টে শরীর বেঁকিয়ে কোনমতে দাঁড়িতে এসে তবেই শ্বাস নেয়।

(ক্রমশঃ)

স্বামী ভজনানন্দজী স্মরণে

—ডঃ সুমঙ্গল সেন

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর চরণাশ্রিতা, মায়ের অন্তরঙ্গপরিকরদের অন্যতমা স্বামী ভজনানন্দজী গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পুণাতে প্রায় আশি বছর বয়সে নশ্বর দেহকে ত্যাগ করে অমরলোকে যাত্রা করেন।

সর্বজনের আপন "পুষ্পদি" প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে যেদিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেদিন থেকেই পুষ্প ব্রহ্মচারিণী। পূর্বাশ্রমে তিনি "সাবিত্রী"। জন্ম সাবিত্রী চতুর্দশী তিথিতে, তাই নাম সাবিত্রী। আশ্রমে প্রবেশ করে 'পুষ্প' হলেন, সেই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিতা ও বন্দিতা। সর্বশেষে হৃষিকেশে পরমপূজ্য স্বামী চিদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র যখন নিলেন, তখন নাম হল স্বামী ভজনানন্দ। কিন্তু 'পুষ্পদি' রূপেই তিনি পরিচিতা রইলেন শেষ পর্যন্ত।

জন্ম ১৪ই মে, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা ৩১শে বৈশাখ, ১৩৩০ সন। ময়মনসিংহ জেলার সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে তাঁর জন্ম। পিতা স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি উভয়বঙ্গের কিংবদন্তী প্রধান শিক্ষক। সংসার আশ্রমে উমেশ চন্দ্র সেন। মাতা ক্ষীরোদ বাসিনী দেবী শ্রীহট্টের বিখ্যাত দস্তিদার পরিবারের জ্যোতির্ময় পুরুষ রজনীকান্ত রায় দস্তিদারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ক্ষীরোদ বাসিনী উচ্চশিক্ষিতা হয়েছিলেন গৃহেই, কেননা তখনকার দিনে ওই পরিবারের কন্যাদের বাইরে পড়াশুনা আভিজাত্যের পরিপন্থী ছিল।

ভজনানন্দর বিদ্যালাভ কলকাতা, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস্ স্কুল, ঢাকার নারীশিক্ষা আশ্রম ও কামারুন্নেসা গার্লস্ কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মুখেই ঢাকার দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয় এল। স্কুলে বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষা মাতৃদেবী, মাতামহ ও অন্যান্য ওস্তাদদের কাছে। ঢাকার আকাশবাণীতে তখন শুধু বয়স্কদের প্রোগ্রামই হত। সেখানেও তিনি নিয়মিত শিল্পী যখন হলেন, তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তারপর চারের দশকের অনেকটা সময় জুড়ে তালিম নিলেন সুখেন্দু গোস্বামীর কাছে "সঙ্গীত ভারতী" প্রতিষ্ঠানে। কিছুকাল ঢাকায় তাঁর নিজের স্কুল নারীশিক্ষা আশ্রমে শিক্ষকতা করেন। বেহালাবাদন শিক্ষালাভ করেন তাঁর মাতামহের অনুজ তখনকার বিখ্যাত বেহালাবাদক যামিনীকান্ত রায় দস্তিদারের কাছে।

সর্বগুণে গুণান্বিতা, ভাগবতী তনু, শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, আশ্রমের প্রায় প্রতিটি শাখায় শ্রীশ্রীমার চরণস্পর্শ যেখানে–যেখানে পড়েছে, প্রায় সর্বত্র তাঁর নিত্য অনুগামিনী ছিলেন।

সর্বশেষে যখন সজ্ঞানে তিনবার স্পষ্টভাবে "মা, মা, মা," উচ্চারণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁরই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে তাঁর নশ্বর দেহ কনখল নিয়ে যাওয়া হল। তারপর তৃতীয়দিন সোমবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে বহু সন্ন্যাসী, মহাত্মা, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী ও পূর্বাশ্রমের আত্মীয় পরিজন তাঁর পার্থিব দেহ হরিদ্বারে দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গাবক্ষে "জল সমাধি" দিলেন।

আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল—

শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র আশ্রম কনখলে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী যথারীতি শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমের প্রাচীনতমা প্রব্রাজিকা স্বামী ভজনানন্দজী (সকলের আদরের "পুষ্পদি") যিনি আশ্রমের সুগায়িকা ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত নিজের সংগীত সাধনার দ্বারা আশ্রমের সেবা করে গেছেন তিনি গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পুণাতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁর পবিত্র দেহ পরদিন আকাশপথে দিল্লী আনা হয়। সেখান থেকে কনখলে আনা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাতে। পরদিন ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে দিব্য জীবন সংঘের কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং মহানির্বাণী আখাড়ার মহন্ত স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর উপস্থিতিতে সন্ন্যাসীর প্রথামত সমস্ত অন্তিম কৃত্য শেষ করে নীলধারায় স্বামী ভজনানন্দজীর পূত মরদেহকে সমাহিত করা হয়। ৪ঠা মার্চ কনখল আশ্রমে যথারীতি তাঁর ষোড়শী ভান্ডারা সম্পূর্ণ হয়। আগামী সংখ্যায় স্বামী ভজনানন্দজীর শুদ্ধ পবিত্র জীবন প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

গত ১লা মার্চ মহাশিবরাত্রি সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন দোল উৎসবও উদ্‌যাপিত হয়েছে।

২। বারাণসী—

বারাণসী আশ্রমে কন্যাপীঠে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী গুরুপ্রিয়াদিদির জন্মদিনও অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় স্বামী ভজনানন্দজীর ব্রহ্মলীন হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপীঠে কীর্তন ও সম্পূর্ণ গীতা পাঠ আরম্ভ হয়ে যায়। ভজনানন্দজীর সঙ্গে কন্যাপীঠের অতি মধুর সম্বন্ধ ছিল প্রথম থেকেই। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দীর্ঘ ৫৫ বছর আগে আসার পর সর্বপ্রথম তিনি কাশীধামে কন্যাপীঠেই বেশ কিছু সময় ছিলেন। তাই তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই মেয়েরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ৪৮ ঘন্টা অখন্ড কীর্তন চালিয়ে যায় শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশিত বিধান মত। জল সমাধি হওয়ার পর থেকে ৪ঠা মার্চ ষোড়শী ভান্ডারা পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ১ ঘন্টা কীর্তন, গীতা পাঠ ও ভাগবত পাঠ হয়েছে।

৪ঠা মার্চ ষোড়শী ভান্ডারার দিন ১৬ জন সাধুকে বস্ত্র, আসন, রুদ্রাক্ষের মালা, গীতা, ফল ও দক্ষিণা সহ ভালভাবে ভোজন করানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ৫১জন কুমারীকেও বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভোজন করানো হয়। প্রথমে শিবের ষোড়শোপচারে পূজা সম্পন্ন হয়। প্রায় তিনঘন্টা খুব জমজমাট কীর্তন হয়। এইরূপে স্বামী ভজনানন্দজীর ষোড়শীভান্ডারা কাশীধামে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে ষোড়শোপচারে বিশেষ ভাবে শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১লা মার্চ মহা শিবরাত্রিও সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মাতা আনন্দময়ী হাসপালের প্রাঙ্গণে আশ্রমের পক্ষ হতে নবনির্মিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত অতিথি ভবনের শুভ প্রবেশ পূজা গত ১৩ই মার্চ ফাল্গুন শুক্লা দশমী তিথিতে শ্রীশ্রী নারায়ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি

সহ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত এবং বাবা ভোলানাথের কৃপাধন্য শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন গাঙ্গুলী (দাসুদার) বিশেষ আর্থিক সাহায্যেই দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত বারাণসী আশ্রমে একটি অতিথি নিবাস নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে ভক্তদের সহযোগিতায় অতিথি নিবাসের দোতলার কাজও আরম্ভ হবে।

১৪ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী নারায়ণ ও শ্রীশ্রী গোপালকে আবির প্রদান, মহা অভিষেক, শৃঙ্গার ও ষোড়শোপচারে সুন্দর ভাবে পূজা সম্পন্ন হয়।

আগামী ৯ই এপ্রিল হতে ১২ই এপ্রিল শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা এবং ১০ই শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে নাক, কান, গলা রোগের উপর আয়োজিত দ্বিদিবসীয় রাষ্ট্রীয় কার্যশালার উদ্বোধন হয়। রোগীদের নাক, কান, গলা রোগের বিনামুল্যে পরীক্ষা ও অপারেশন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মুম্বাই হতে নাক, কান, গলা রোগের ভারত বিখ্যাত সার্জন ডাঃ এ০বী০ আর০ দেশাই এই সেবার কাজে যোগদান করেন। ডা০ এ০বী০ আর০ দেশাইএর সুযোগ্য পুত্র ডা০ অসীম দেশাইও সঙ্গে এসেছিলেন। এই উপলক্ষে হাসপাতালের উপরের ছাদে খুব সুন্দর শিবির বানানো হয়েছিল। ডা০ দেশাই হাসপাতাল পরিদর্শন করে খুবই খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন এই রূপ শিবিরের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের হাসপাতালই উপযুক্ত স্থান।

৩। বৃন্দাবন—

শ্রীশ্রীমায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে গত ১লা মার্চ শ্রীশ্রী মহাশিবরাত্রি মহোৎসব সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রী সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের রুদ্রাভিষেক এবং বিশেষ পূজা হয়। ভক্তগণ ব্যক্তিগত ভাবেও রাত্রিতে শিব পূজা করেন।

বৃন্দাবন আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী মহোৎসবও গত ১১ই মার্চ হতে ১৮ই মার্চ বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১১ই মার্চ হতে ১৭ই মার্চ গোস্বামী শ্রী ইন্দুভূষণ মহারাজ (রামায়ণী) প্রতিদিন শ্রীরাম কথা শ্রবণ করান। ১৩ই মার্চ হতে ১৭ই মার্চ প্রতিদিন বিকালে শ্রী রামজী শর্মার অধ্যক্ষতায় রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় নামযজ্ঞের অধিবাস ও সারারাত অখন্ড শ্রীহরি নাম সংকীর্তন ও ১৮ই দোল পূর্ণিমার দিন নাম যজ্ঞ, শ্রীমন মহাপ্রভুর ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ ছলিয়া এবং শিবেরও ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সাধুসেবা ও সন্ধ্যায় অখন্ড নাম সংকীর্তনের পরিসমাপ্তি হয়।

৪। ভীমপুরা—

ভীমপুরা আশ্রমের পক্ষ থেকে আমেদাবাদে 'দিব্য আনন্দধামে' গত ২৯শে জানুয়ারী হতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সংযম সপ্তাহ আয়োজিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারী এখানেই শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভীমপুরা আশ্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়। প্রবক্তা ছিলেন বৃন্দাবন নিবাসী শ্রী রাজেশ কিশোর গোস্বামী। ১লা মার্চ মহাশিবরাত্রি পূজাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। তারাপীঠ—

তারাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও বাৎসরিক উৎসব এবার বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভজন কীর্তন, সৎসঙ্গ, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, স্থানীয় মন্দির সমূহে পূজা, অধিবাস, নগরকীর্তন, রামায়ণ গান, সাধুভান্ডারা, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আনন্দ মিলনোৎসবের সমাপ্তি হয়।

এই বিশেষ উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনায় ছিলেন আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বপন গাঙ্গুলী। এই উপলক্ষে কন্যাপীঠের অধ্যাপিকা ব্রহ্মচারিণী গীতা দ্বারা লিখিত তারাপীঠ আশ্রম ও শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন করে একটি পুস্তিকাও প্রকাশন হয়েছে যা ভক্তরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

৬। জামশেদপুর—

জামশেদপুর স্থিত আশ্রমে দেবীপক্ষে প্রতিদিন চন্ডীপাঠ হয়েছে এবং দীপাবলী উপলক্ষে আশ্রমের কালীমন্দিরে বিশেষ কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা শেষে সমবেত ভক্তবৃন্দ ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ১২ই নভেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত আশ্রমে সংযম সপ্তাহ পালিত হয়েছে।

আশ্রমে নিয়মিত সৎসঙ্গ, প্রতি পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ পূজা, প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ কালীপূজা ও প্রতি শনিবার শনিপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আবশ্যক সুচনা

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানানো হইতেছে যে শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় এবং জনৈক ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় পরম পবিত্র বারাণসী ধামে গঙ্গার অতি সন্নিকটে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণে ভক্তদের বিশেষ সুবিধার্থে দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি অতিথি ভবনের নির্ম্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। উপস্থিত চারটি প্রশস্ত ঘর (সংলগ্ন রান্না ঘর ও স্নানাগার সহ) একতলায় নির্ম্মিত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতল ও ত্রিতলে আরো আটটি ঘর ভক্তদের থাকিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে।

এই বিশেষ কার্যে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সত্বর নিম্ন ঠিকানায় পত্র দ্বারা যোগাযোগ করিবেন আশা করা যাইতেছে। ভক্তদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে প্রতিটি ঘরের জন্য আনুমানিক ব্যয় ২.২৫.০০০/- টাকা।

১লা এপ্রিল, ২০০৩

শ্রী পানু ব্রহ্মচারী
মাতা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১

শোক-সংবাদ

১। শ্রী আনন্দ ব্যানার্জী—

শ্রীশ্রীমায়ের অতি প্রাচীন ভক্ত স্বর্গীয় প্রফুল্ল কুমার ব্যানার্জীর পৌত্র ও শ্রী প্রণব ব্যানার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী আনন্দ ব্যানার্জী গত ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০২ বারাণসীতে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে লীন হয়েছেন। ১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৩ সালে আনন্দের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের তিনদিন পরেই শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ করেন। মায়ের চরণে অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁর অকাল প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

২। শ্রীমতী ননীবালা চ্যাটার্জী—

বিগত ২২শে জানুয়ারী, ২০০৩ অধুনা কোলকাতা নিবাসী মাতৃভক্ত ননীবালা চ্যাটার্জী (শ্রীমতী রমা ব্যানার্জীর মাতা) ১০২ বছর বয়েসে মাতৃ শ্রীচরণে চির আশ্রয় লাভ করেন। ঢাকা শাহবাগে তিনি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন এবং পরবর্তী কালে কোলকাতায় বসবাস কালে একডালিয়া আশ্রম ও আগরপাড়া আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও নানা ভাবে সেবার কাজে সহায়তা করতেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ননীদি নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং সৎসঙ্গেও অংশ নিয়েছেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

৩। শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর বসুরায়—

সল্টলেক নিবাসী শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর বসুরায় ৮৪ বছর বয়সে ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে স্বীয় নিবাসে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর দীক্ষিত ছিলেন এবং পরিবারের সকলেই মাতৃ আশ্রিত। আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার চির শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

৪। কুমারী মলয়া সেনগুপ্ত—

শ্রীশ্রীমায়ের অতি প্রাচীন জামশেদপুর বাসী ভক্ত ঁলক্ষ্মী নারায়ণ সেনগুপ্তর কন্যা কুমারী মলয়া সেনগুপ্ত ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে জামশেদপুর স্থিত বাসভবনে সজ্ঞানে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। মলয়াদি টাটা আয়রণ ও স্টীল কোং র শিক্ষা বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে চাকরী করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যান ধারণায় তিনি মাতৃময় হয়ে থাকতেন। তাঁর স্নেহের ফল্গুধারা তাঁর ভাই বোনেদের ও গুরুভাই বোনেদের উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হত। মলয়াদির মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমায়ের জামশেদপুর স্থিত ভক্তরা একজন অভিভাবককে হারাল।

আমরা মাতৃচরণে তাঁর সদ্গতির কামনা করি ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

৫। শ্রী তারা প্রসন্ন বর্দ্ধন—

কোলকাতা যোধপুর পার্ক নিবাসী শ্রী তারা প্রসন্ন বর্দ্ধন ৯১ বছর বয়সে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁরা মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন ১৯৭৪ সালে যোধপুর পার্কে ভাগবত অনুষ্ঠানে। তারপর থেকে নিয়মিত আগরপাড়া আশ্রম ও মৌনমিলনীর সৎসঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি ও পুত্র কন্যাদের কল্যাণ কামনা করি।

৬। শ্রী পরমেশ লাহিড়ী—

মাতৃভক্ত শ্রী পরমেশ লাহিড়ী গত ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স ৭৭ বছর হয়েছিল। তিনি মায়ের আশ্রিত। আগরপাড়া আশ্রমের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নানা সৎসঙ্গে যোগদান করতেন। আমরা তাঁর আত্মার ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি এবং পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে।

৭। শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য—

কোলকাতার ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রী দুর্গাদাস ভট্টাচার্য ৯৩ বৎসর বয়সে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি শ্রী ১০৮ মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমা) দীক্ষিত ছিলেন। পরিবারের সকলেই মাতৃ আশ্রিত। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি ও পরিবার বর্গের সকলের কল্যাণ কামনা করি।

৮। যুবরাজ শ্রী শরৎ চন্দ্র পদ্মশরণ শাহ

শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত পরিবার বিহার ছোটনাগপুরের মহারাজা ও মহারাণীর বড় জামাতা বিজয়গড়ের যুবরাজ শ্রী শরৎ চন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত। যুবরাজ সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন এবং বারাণসীতেই স্থায়ীভাবে নিবাস করতেন। পরিবারের সকলেরই আশ্রমে নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

জঙ্গলে শিকার করতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে তিনি পরিকরগণ সহ সোনভদ্রের জঙ্গলে শিকার করতে যাচ্ছিলেন নিজে জীপ চালিয়ে। সঙ্গে বেশ অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নক্সালপন্থীরা যুবরাজ ও তাঁর সঙ্গীকে মেরে অস্ত্র শস্ত্র লুট করে জঙ্গলে পলায়ন করে। এই নির্ম্মম হত্যাকান্ডে বারাণসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে তুমুল আলোরণের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই স্তব্ধ।

বিজয়গড় রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা ও রাণী—যাঁরা শ্রীশ্রীমার দর্শন করেছেন, যুবরাজের স্ত্রী, একমাত্র পুত্র এবং দুই কন্যা শোকে মুহ্যমান। শ্রীশ্রীমার চরণে পরলোকগত আত্মার শান্তি এবং পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী — শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী — শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। চতুর্থ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকাশিত। একত্রে মূল্য ১২৫/- টাকা।

মাতৃবাণী — শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা — মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/-টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/-টাকা ও ৪০/-টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/-টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

বিশেষ সূচনা

"পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ"

পন্ডিতপ্রবর পদ্মবিভূষণ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত অমৃতবাণীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয় গ্রন্থের দশম খন্ড সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পরমার্থ পথের পথিক তথা তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি খন্ডই স্বয়ং সম্পূর্ণ। দশম খন্ডের মূল্য ৪৫/- টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :-

১. মহেশ লাইব্রেরী : ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০
২. সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার : ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৬
৩. সর্বোদয় বুক স্টল : হাওড়া স্টেশন
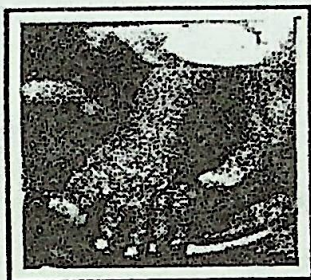
মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে, —

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-26826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-25537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel : 06752-223258)

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-255362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001 (Tel: 0651-2312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233. W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-2310054+2311794)

23. VINDHYACHAL: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-242343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel : 0565-2442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 8802-9356594)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●